বিশুদ্ধবাণী

পঞ্চম ভাগ

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ

সম্পাদিত

বিশুদ্ধবাণী

পঞ্চম ভাগ

মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, এম-এ, ডি-লিট্
সম্পাদিত

'বিশুদ্ধানন্দ কানন' আশ্রম
মালদহিয়া, ৺কাশীধাম
সন ১৩৬৩ সাল

 [মূল্য দুই টাকা

প্রকাশক—
শ্রীজ্যোতির্ম্ময় গাঙ্গুলী
৮৯ ফীডার রোড, বেলঘরিয়া,
জেলা ২৪ পরগণা।

—প্রাপ্তিস্থান—

১। মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ,
বিশুদ্ধানন্দ কানন, মালদহিয়া, বেনারস।

অথবা

২.এ, সিগরা, বেনারস।

২। শ্রীজ্যোতির্ম্ময় গাঙ্গুলী,
৮৯ ফীডার রোড, বেলঘরিয়া,
জেলা ২৪ পরগণা।

৩। শ্রীফণিভুষণ চৌধুরী,
৭৭ (বি), কালী টেম্পল রোড,
কালীঘাট, কলিকাতা-২৬।

৪। শ্রীসরোজমোহন চট্টোপাধ্যায়,
বিশুদ্ধ আশ্রম, বর্দ্ধমান।

৫। মহেশ লাইব্রেরী,
২/১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২।

মুদ্রক—শ্রীসুধীরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
কমলা প্রেস,
বেনারস।

—সূচী পত্র—

শ্রীশ্রীযোগিরাজাধিরাজ বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেব

শ্রীশ্রীযোগিরাজাধিরাজ বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেব

বিশুদ্ধবাণী

পঞ্চম ভাগ

পরমং কাম্যম্

(শ্রেষ্ঠ কাম্য)

রায় সাহেব শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত, কবিরত্ন, এম-এ

অযাচং নির্ব্বন্ধাতিশয়ভরতস্ত্বাং হি জননি
ধনং বিদ্যা খ্যাতিং গৃহসুখমিতি স্বার্থবিততিম্।
মমার্হত্বে চিন্তা ন হি পদমিতা মন্মনসি চ
যতোঽর্থানাং মাত্রাধিকমসি কিলালং বিতরণে ॥১॥

হে জননি, অতিশয় নির্ব্বন্ধভরে ধন, বিদ্যা, যশঃ, গৃহসুখ—এই সকল ভোগের বিস্তার তোমার কাছে চাহিয়াছি। আমি কিসের কত দূর যোগ্য সে চিন্তা আমার মনে স্থান পায় নাই; কেননা ইহা ত প্রসিদ্ধই আছে যে তুমি সকল কাম্য মাত্রার অধিক বিতরণ করিতে সমর্থা।

কদাচিৎ ত্বাং যাচ্ঞাবিষয়ম্ অহহাকার্ষমিতি কিং ?
প্রপন্নেভ্যঃ স্বাঙ্কে গণপতি-চিরাকাঙ্ক্ষিত পদে
সদা যাস্যুদ্যুক্তা পরমশরণং দাতুমপি চ ;
কৃপায়াস্তে সীমা ন খলু বিদিতা কস্যচিদপি ॥২॥

হায়, তোমাকে আমি কখনও চাহিয়াছি কি ? যে তুমি প্রপন্নজনকে গণপতিরও চির আকাঙ্ক্ষিত স্থান যে তোমার অঙ্ক

তথায় পরম আশ্রয়ও দিতে সর্ব্বদা উদ্‌যুক্তা। তোমার কৃপার সীমা ত কেহই জানে না।

স্বয়ং সংপ্রেক্ষ্যৈব প্রপতিতমিমং মোহজলধৌ
জনং বুদ্ধ্বা স্নেহাদ্ অয়মশরণো দুঃস্থ ইতি চ।
মদুদ্ধারোপায়ং বিরচিতবতী ত্বং করুণয়া
নয়ন্তী মাং সাক্ষাচ্ছিবসমুদয়ং সদ্‌গুরুবরম্ ॥৩॥

তুমি আপনা হইতেই আমাকে মোহসাগরে নিপতিত দেখিয়া, এই লোকটি নিঃসহায় ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত স্নেহবশতঃ ইহা বুঝিয়া করুণা পূর্ব্বক সাক্ষাৎ শিবাবতার সদ্‌গুরুবরের নিকটে আমাকে লইয়া যাইয়া আমার উদ্ধারের উপায় প্রকৃষ্টভাবেই করিয়াছ।

ইদানীং ভিক্ষে ত্বাং গুরুচরণয়োর্নির্ভরবলং
বিশুদ্ধার্থাং নিষ্ঠাম্ অনলসতয়া কর্ম্মণি রতিম্।
যথা ব্যর্থা ন স্যান্ময়ি তব কৃপা ক্ষেমবহুলা
তথান্তঃস্থা বুদ্ধিং বিনয় জননি শ্রেয়সি সদা ॥৪॥

এখন তোমার কাছে শ্রীগুরুচরণে বলবৎ নির্ভর, বিশুদ্ধ-বিষয়া নিষ্ঠা এবং (গুরুদত্ত) কর্ম্মে অনলস আসক্তি ভিক্ষা করি। আর তুমি আমাকে যে মঙ্গলবহুলা কৃপা করিয়াছ, তাহা যাহাতে ব্যর্থ না হয়, তজ্জন্য আমার অন্তরে স্থিত হইয়া মঙ্গল্য বিষয়ে আমার বুদ্ধিকে বিনীত (সংযত, শিক্ষিত) কর।

দেহ ও কর্ম্ম

মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, এম-এ, ডি-লিট্

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

চতুর্থ প্রস্তাব

জ্ঞানগঞ্জ রহস্য

(৬)

জ্ঞানগঞ্জ সম্বন্ধে গত বারে কিছু আলোচনা করা হইয়াছে। তাহা হইতেই জ্ঞানগঞ্জের তত্ত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। জ্ঞানগঞ্জ এক প্রকার অভিনব আবিষ্কার বলা চলে অথচ অনাদি কাল হইতেই ইহা বিদ্যমান রহিয়াছে—প্রথমে অব্যক্ত রূপে, তাহার পর অভিব্যক্ত ও পুষ্টরূপে। আমরা গত প্রবন্ধে পর পর তিনটি যোগ-ভূমির কথা বলিয়াছি—এগুলি যোগীর উপলব্ধিগোচর এবং প্রাপ্য মায়াতীত ও কালাতীত রাজ্য। এই তিনটির মধ্যে প্রথমটিকে আমরা গুরুধাম অথবা গুরুরাজ্য বলিয়া নামকরণ করিয়াছি—দ্বিতীয়টিকে জ্ঞানগঞ্জ বলিয়াছি এবং তৃতীয়টির কোন নাম নির্দ্দেশ করি নাই, কারণ উহা এখনও অব্যক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্ত অবস্থায় ফুটিয়া উঠে নাই। প্রথম যোগ-ভূমিরূপ গুরুরাজ্যটি আগম শাস্ত্রে বিশুদ্ধ অধ্বা নামে সাঙ্কেতিক ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সাধারণতঃ

প্রচলিত সাধন-প্রণালীতে উহার স্পষ্ট সন্ধান পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু গুহ্য সাধন-সংক্রান্ত আগম সাহিত্যে উহার অতি স্পষ্ট নির্দ্দেশ আছে।

আমরা শুষ্কজ্ঞান ও দিব্যজ্ঞানের আলোচনা প্রসঙ্গে এই উভয় জ্ঞানের মধ্যে ভেদ প্রদর্শন করিয়াছি। শুষ্কজ্ঞানের সন্ধান সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়; কিন্তু উহা দ্বারা পূর্ব্ববর্ণিত গুরুরাজ্যে প্রবেশ করা যায় না, জ্ঞানগঞ্জ প্রভৃতিতে প্রবেশ ত বহু দূরের কথা। দিব্যজ্ঞানের আশ্রয় ব্যতীত গুরুরাজ্যের দ্বার উন্মুক্ত হয় না। প্রাচীন গুহ্য শাস্ত্রে এই পর্য্যন্ত স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করা ছিল। এই গুরুরাজ্য সৃষ্টির অবতরণ মুখে লক্ষিত হয় না। কারণ আত্মা অণুরূপে সঙ্কুচিত হইয়াই সাক্ষাৎ ভাবে ঈশ্বর প্রেরণায় মায়া-গর্ভে পতিত হয় এবং কর্ম্মজালে জড়িত হইয়া পড়ে। তদনন্তর তাহার ভোগ-প্রধান সংসার জীবন আরম্ভ হয়। গুরুরাজ্যের অস্তিত্ব অবতরণশীল চিদণুর দৃষ্টিগোচর হয় না। পক্ষান্তরে ফিরিবার সময় উচ্চ অধিকার সম্পন্ন হইলে গুরুরাজ্যে প্রবেশ হয় এবং ভাগ্য থাকিলে উহার ভেদও হয়। যে সকল আত্মাতে কুণ্ডলিনী শক্তি কম জাগ্রৎ হয় তাহারাও গুরু কৃপার অংশীদার তাহা সত্য, কিন্তু এই গুরু-কৃপা প্রত্যগাত্মার কৃপাত্মক পুরুষকার রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। ইহার ফলে বিবেক-জ্ঞানের উদয় হয়, যাহার প্রভাবে অনাত্মাতে আত্মদৃষ্টিরূপ ভ্রান্তি নিবৃত্ত হয় ও আত্মস্বরূপ অনাত্মভাব হইতে মুক্ত হইয়া চিদ্‌রূপে প্রকাশিত হয়। এই জ্ঞানের অনলে কর্ম্মবীজ দগ্ধ হইয়া যায় বলিয়া আত্মস্বরূপ-স্থিতি হইতে চ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না

এবং পুনর্ব্বার জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্ত্তিত হইবার আশঙ্কাও থাকে না। ইহাই প্রচলিত কেবলীভাব বা কৈবল্য।

কিন্তু যে সকল আত্মা গুরুর তীব্রতর কৃপা প্রাপ্ত হয় তাহারা আরও উচ্চপদের অধিকারী হয়—তাহাদের কুণ্ডলিনী-জাগরণের পর ক্রমশঃ ঊর্দ্ধগতি হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত আত্মার কুণ্ডলিনী জাগরণ হইতে দ্বিতীয় প্রকার আত্মার কুণ্ডলিনী জাগরণ অধিক মহত্ত্বসম্পন্ন। কারণ এইস্থানে ঊর্দ্ধগতির সূচনা হয় এবং চরম অবস্থায় ঊর্দ্ধতম শিখর পর্য্যন্ত পৌছান যায়। বোধই আত্মার স্বরূপ, ইহা প্রথম ক্ষেত্রেও অভিব্যক্ত হয়। তাই এই স্থিতিও চিৎস্বরূপে স্থিতি তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু চিৎশক্তির বিকাশ ইহাতে থাকে না। দ্বিতীয় জাগরণে চিৎশক্তির উন্মেষ হয়। অবশ্য ইহা আভাস—ইহারই নাম শুদ্ধ বিদ্যার উদয় অথবা গুরুরাজ্যে প্রবেশ। শুদ্ধ বিদ্যার পূর্ণত্ব হইতেই ভবিষ্যতে শিবত্বের অভিব্যক্তি হয়। শুদ্ধ বিদ্যা গুরুরাজ্যের বস্তু, ইহাই দিব্যজ্ঞান। ইহাতে জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি উভয়ই থাকে। কৈবল্যরূপ স্থিতিতে চিৎস্বরূপে স্থিতি হয় বটে, কিন্তু চিৎশক্তির আভাসাত্মক উন্মেষও থাকে না। কিন্তু গুরুরাজ্যে চিৎশক্তিরই ক্রমশঃ অধিকতর বিকাশ ঘটিয়া থাকে—প্রথমে মিশ্রভাবে অর্থাৎ রিপুর সহিত মিলিত ভাবে, পরে শুদ্ধ ভাবে। গুরুরাজ্যের দ্বার উন্মুক্ত হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞানশক্তির পরিপূর্ণ উন্মেষ হয় এবং সমগ্র বিশ্ব কেন্দ্রস্থ এক অহং ভাবের উপরে স্পষ্টভাবে ভাসিতে থাকে দেখিতে পাওয়া যায়। তখন অহং ভাবই হয় আত্মস্বরূপের পরিচায়ক—ইহাই আত্মাতে আত্মবুদ্ধির উদয়ের প্রতীক, ইহারই নাম বলের বিকাশ।

শক্তির জ্ঞানাংশ অনাবৃত থাকে সম্পূর্ণভাবে, কিন্তু ক্রিয়াংশ ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করে। ক্রিয়াশক্তির ক্রমিক অভিব্যক্তির ফলে আত্মনিষ্ঠ অহংভাব ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে থাকে—পূর্ণ গুরুতত্ত্বে যাইয়া অখণ্ড বোধের উপর পূর্ণ অহংভাব ফুটিয়া উঠে। প্রথমে যে অহংএর উপর ইদংভাবের আভাস ছিল পরে তাহা আর থাকে না। এই প্রকাশাত্মক শিব ভাবই গুরুরাজ্যের কেন্দ্র। এইখানে মিলিত জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি ইচ্ছাশক্তি বা স্বাতন্ত্র্যরূপে দেখা দেয়। ইহারও ক্রমিক বিবর্ত্তন আছে—ইচ্ছার যেটি পূর্ণতম বিকাশ সেইখানেই জ্ঞান ক্রিয়া ও ইচ্ছার পূর্ণ একত্ব সিদ্ধ। বস্তুতঃ শিব ও শক্তির একত্বও সেইখানেই। প্রাচীন গুহ্য সাধনাতে এইখানেই পরমশিবের স্থিতি এবং ইহাই পূর্ণত্বের নিদর্শন। যাহাকে দিব্যজ্ঞান বলা হইয়াছিল তাহার প্রাথমিক স্তরের পরিসমাপ্তিও এইখানেই।

এইভাবে দেখা যায় যে চিদণু মায়াতে নামিবার সময় গুরুরাজ্যের সন্ধান পায় না বটে, কিন্তু ফিরিবার সময় উচ্চ অধিকার সম্পন্ন হইলে সন্ধান পাইয়া থাকে। তবে ইহার পরে যে আরও কিছু থাকিতে পারে তাহা অনভিজ্ঞ পথিক সাধারণতঃ জানিতে পারে না। জ্ঞানগঞ্জের সত্তা বাস্তবিকপক্ষে গুরুরাজ্যেরও অতীত। যথার্থভাবে দেখিতে গেলে এই জ্ঞানগঞ্জই উচ্চতর গুরুরাজ্যের ভূমিস্বরূপ, অর্থাৎ জ্ঞানগঞ্জ হইতে জ্ঞানগঞ্জের লক্ষ্য-স্থান পরমা প্রকৃতি পর্য্যন্ত যে বিশাল রাজ্য রহিয়াছে তাহা পূর্ব্বে জ্যোতি মাত্র ছিল, রাজ্যরূপে পরিণত ছিল না, কিন্তু উহা মহা-খণ্ডযোগীর কালদেহানুষ্ঠিত কর্ম্মের প্রভাবে রাজ্যরূপ ধারণ

করিয়াছে। জ্ঞানগঞ্জ এবং পূর্ব্বোক্ত গুরুরাজ্য স্তরে ভিন্ন হইলেও প্রকারে ভিন্ন নহে। বলা বাহুল্য, এই বিশাল যোগভূমিও অর্থাৎ মহা-খণ্ডযোগীর অধিকার-ক্ষেত্রও প্রকৃত গুরুরাজ্য নহে। তবে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত গুরুরাজ্যের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ ইহাকেই বলা চলে। প্রকৃত চরম আদর্শ অখণ্ড গুরুরাজ্য যাহা এখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই এবং যাহা প্রতিষ্ঠার জন্য কর্ম্মী যোগিমণ্ডলের মধ্যে আন্দোলন চলিতেছে। প্রথম গুরুরাজ্য হইতে দ্বিতীয় গুরুরাজ্য অধিকতর ব্যাপক এবং উচ্চতর, কিন্তু অখণ্ড গুরুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইলে এই উচ্চ-নিম্ন ভাব থাকিবে না এবং ব্যাপকত্ব সমগ্র সৃষ্টিকে আশ্রয় করিবে বলিয়া পূর্ব্বের গুরুরাজ্য এবং মধ্যবর্ত্তী জ্ঞানগঞ্জ কালের সৃষ্টির সহিত উহারই অন্তর্গত হইয়া পড়িবে।

কালের রাজ্যে কালের দেহ আশ্রয় করিয়া কর্ম্মের সমাপ্তি আবহমান কাল হইতে এখন পর্য্যন্ত সিদ্ধ হয় নাই। অবশ্য আমি যোগীরই কর্ম্মের কথা বলিতেছি, সাধকের কথা নহে। কর্ম্মের আপেক্ষিক সমাপ্তি অবশ্য হইয়াছে, এমন কি কালের রাজ্যেই কেহ না কেহ ইহা সম্পাদন করিয়াছেন ইহাও সত্য, কারণ তাহা না হইলে পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানগঞ্জ ও গুরুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত না। কর্ম্মের যথার্থ সমাপ্তি হয় নাই বলিয়াই পূর্ব্বোক্ত কোন রাজ্যেই মধ্যবিন্দু ঠিক ঠিক স্থাপিত হয় নাই—ঐ সব স্থানে মধ্যবিন্দু যাহা গুরুর আসন তাহা অধিকার করিয়াছেন 'মা', গুরু নহেন। অবশ্য ঐ স্থানে 'মা'ই গুরু। প্রথম রাজ্যে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত গুরুরাজ্যে মাই শিবরূপে প্রকট। জ্ঞানগঞ্জাত্মক দ্বিতীয়

ক্ষেত্রে বিশাল ত্রিশক্তিময় ত্রিকোণ রাজ্য স্থাপিত রহিয়াছে, তিন কোণে তিন শক্তির রাজ্য রহিয়াছে—একটি হইতে অপরটি অধিকতর ব্যাপক। ত্রিকোণের মধ্যবিন্দুতে পরমা প্রকৃতির অধিষ্ঠান। এইটিই তুরীয় বিন্দু এবং বিশ্বসৃষ্টির অন্তরতম ও উর্দ্ধতম স্থিতি-কেন্দ্র। জ্ঞানগঞ্জের কর্ম্ম কালের দেহে সমাপ্ত হইলে এই বিশাল পরমা প্রকৃতির রাজ্যে প্রবেশ করিয়া মধ্যবিন্দুতে স্থিতি লাভ করা যায়। প্রথমটি হইতে এইটি শ্রেষ্ঠতর গুরুরাজ্য ইহা সত্য, কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইহাও প্রকৃত গুরুরাজ্য নহে। এই স্থলেও 'মা'ই গুরুরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। ইহাও প্রকৃত গুরুর স্ব-স্থান নহে। এই রাজ্য ভেদ করার পর অখণ্ড গুরুরাজ্যের প্রারম্ভ বলিতে পারা যায়। কিন্তু ইহা এখনও অব্যক্ত রহিয়াছে। এই অখণ্ড গুরুরাজ্যের আলোচনা পরে হইবে। তবে ইহা মনে রাখিতে হইবে প্রকৃতির বা মার রাজ্যই আনন্দের রাজ্য, পরমা প্রকৃতি ভেদের পর চৈতন্য রাজ্যের সূত্রপাত হয়, তৎ পূর্ব্বে নহে।

কিন্তু এইখানে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে। প্রথম গুরুরাজ্যের যেটি চরম লক্ষ্য সেইখান হইতেই প্রকৃত অখণ্ড গুরুরাজ্যে যাওয়ার পথ বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ পথ সূর্য্যমণ্ডলের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়াছে এবং যোগ্য অধিকারী ভিন্ন সকলে ঐ পথে চলিতে পারে না। সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিতে হইলে মহাজ্ঞান আবশ্যক হয়। এই মহাজ্ঞানের প্রাপ্তি প্রথম গুরু-রাজ্যের কেন্দ্রে স্থিত হইতে পারিলে উর্দ্ধ হইতে আপেক্ষিক মহাকৃপা সঞ্চারের ফলে আপনিই ঘটিয়া থাকে। এই আংশিক

মহাকৃপা ব্যতীত প্রথম গুরুরাজ্য ভেদ করা সম্ভবপর হয় না। ইহার ফলে অখণ্ড গুরুরাজ্য উদ্ভাবনের পক্ষে অপরিহার্য্য সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া যায় ইহা সত্য। কিন্তু জ্ঞানগঞ্জের লক্ষ্যীভূত পরমা প্রকৃতিকে ভেদ করিতে না পারিলে প্রথম কৃপা কার্য্যকরী হয় না এবং অখণ্ড গুরুরাজ্য প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা থাকে না। পরমা প্রকৃতিকে ভেদ করিতে হইলেও পূর্ব্বোক্ত মহাজ্ঞানই আবশ্যক হয়। পূর্ব্বে সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করা থাকিলে এবং তাহার পর প্রকৃতি-রাজ্য ভেদ করা হইয়া গেলে প্রকৃত গুরু বা বিশুদ্ধ ভগবৎ সত্তাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রথম গুরুরাজ্যে কেন্দ্র স্থাপন হয় নাই—উহার বাহিরে কালের ঘের বিদ্যমান রহিয়াছে। দ্বিতীয় গুরুরাজ্য আরও উর্দ্ধে অবস্থিত। ইহার ভূমি পূর্ব্ববর্ণিত জ্ঞানগঞ্জ এবং শেখর সেই বিন্দুটি, যাহা লোকোত্তর কর্ম্মের প্রভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এখন পর্য্যন্ত সূর্য্যমণ্ডল ভেদের কোন প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু সূর্য্যমণ্ডল ভেদ না হইলে প্রকৃত গুরুরাজ্যে প্রবেশের সম্ভাবনা থাকে না। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাকৃপা ইহার পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে, তজ্জন্য তৃতীয় মহাকৃপা আবশ্যক হয়। এই মহাকৃপাতে প্রকৃত অর্থাৎ অখণ্ড গুরুরাজ্যের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া যায়। তখন এমন একটা ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হয় যাহাতে জগতের যাবতীয় প্রাচীর ভগ্ন হইয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত রাজ্য ভাঙ্গিয়া যায়, চিদাকাশে চিন্ময় রাজ্যও ভাঙ্গিয়া যায় এবং মায়া হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত সকল স্তরের অধিবাসীদের পক্ষেই লক্ষ্য খুলিয়া যায়। এই অভিনব রাজ্যে সকল স্তরের জীবেরই প্রবেশের সমান অধিকার। ইহা কাহাকেও উপেক্ষা করে না,

ইহাতে কাহারও বঞ্চিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। ইহাতে প্রবেশ করিবার এবং অবস্থান করিবার অধিকার সকলেরই আছে। এই অভিনব রাজ্যের দ্বার উন্মুক্ত হইলে ইহার ভিতরে সমস্ত বিশ্বেরই স্থান লাভ হইয়া থাকে। এই স্থান-প্রাপ্তির মধ্যে যোগ্যতা-বিচার অবশ্য আছে, কিন্তু প্রবেশ সম্বন্ধে যোগ্যতার কোন প্রশ্নই নাই। যোগ্য হউক অথবা অযোগ্য হউক এইখানে প্রবেশের সকলেরই সমান অধিকার। এই পরম গুরু-রাজ্যে কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই কেন্দ্ররূপী আসনে কর্ম্মী সন্তান শ্রেষ্ঠতম অধিকার প্রাপ্ত হইয়া বসিতে পায়। তখন বিশ্ব-কমল প্রস্ফুটিত হয়, তাহা অনন্ত দল সম্পন্ন— পূর্ব্ববর্ত্তী বিভিন্ন রাজ্যের যাবতীয় প্রজা ঐ সকল রাজ্য ভাঙ্গিয়া যাওয়ার পর এই অখণ্ড গুরুরাজ্যে আসন লাভ করে। পৃথিবী বাসী যাবতীয় মনুষ্যও তখন ঐ মহাকমলের দলে স্থিত হয়, ইহাই তাহাদের আসন। এই আসন লাভ করিবার জন্য এই অখণ্ড রাজ্যের কেন্দ্রস্থ অধিষ্ঠাতার অনুজ্ঞা আবশ্যক হয়, কারণ তাহার অনুমতি বা অনুগ্রহ ব্যতীত তাহার রাজ্যে প্রজা অবস্থান করিতে পারে না। প্রকারান্তরে বলা যায়, কেন্দ্রস্থ অধিষ্ঠাতা হইতে সঞ্চারিত শক্তি ও অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া ঐ রাজ্যে স্থিতি লাভ হয়।

কিন্তু এইখানেই শেষ নহে। প্রথম গুরুরাজ্যে গুরুর অনুগ্রহ আশ্রয় করিয়া প্রবেশ হয়। অনুগ্রহ এবং কর্ম্ম-প্রাপ্তি কালের দেহে অর্থাৎ মরদেহে হইয়া থাকে। মরদেহেই কর্ম্ম সম্পূর্ণ হইলে রাজ্যের কেন্দ্রে উপবেশন করিতে পারা যায়, নতুবা চারি পার্শ্বে। ঐখান হইতে কর্ম্মের অনুষ্ঠান ক্রমশঃ পূর্ণ হইতে

হইতে কেন্দ্র পর্য্যন্ত যাওয়ার অধিকার জন্মে। ইহাই শিবত্ব। দ্বিতীয় রাজ্যে কেন্দ্রাধিষ্ঠাতা গুরুর অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া কর্ম্মে অধিকার জন্মে। ইহা মরদেহের কথা। ঐ দেহে কর্ম্ম পূর্ণ হইলে পূর্ব্ববৎ কেন্দ্রে বসিবার অধিকার জন্মে। ইহা উচ্চতর কেন্দ্র। কালের দেহে কর্ম্ম পূর্ণ না হইলে—জ্ঞানগঞ্জ যাইয়া সেইখান হইতে কর্ম্ম পূর্ণ করিতে হয়। উহা সুদূর ভবিষ্যতের কথা। এই উভয় স্থলেই মরদেহে কর্ম্ম সম্পূর্ণ হইবার যেমন সম্ভাবনা আছে তেমন অসম্পূর্ণ থাকিবারও সম্ভাবনা আছে। অখণ্ড গুরুরাজ্যের সম্বন্ধেও ঐ একই নিয়ম। এই স্থলেও কর্ম্ম-প্রাপ্তি মরদেহেই হয়। মরদেহে কর্ম্ম পূর্ণ হইলে ঐ রাজ্যের মধ্য বিন্দুতে আসন পাওয়া যায়। তখন কালের সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটে, অর্থাৎ কাল আর থাকে না, মৃত্যুর মৃত্যু হইয়া যায়। প্রথম ও দ্বিতীয় রাজ্যে কেন্দ্র হইতে বাহিরে কর্ম্ম দান সম্ভবপর নহে। কেন্দ্র হইতে কালের রাজ্যে কর্ম্ম দেওয়া হয়, তাহার পর ঐ কর্ম্ম পূর্ণ করিবার ভার থাকে আশ্রিতের উপর। কালের জগতে উহা পূর্ণ করিতে পারিলে ত কথাই নাই, নতুবা কিঞ্চিৎ কাল-স্পর্শযুক্ত অমর গুরুরাজ্যে গিয়া সুদীর্ঘ কালে উহা পূরণ করিতে হয়। উহা পূরণ না করিলে গুরুর ঋণশোধ হয় না, গুরুর অনুগ্রহ নিরর্থক হইয়া পড়ে। দ্বিতীয় রাজ্যেও তাই। কিন্তু তৃতীয় রাজ্যে ঠিক তাহা নহে, কারণ ঐ রাজ্য সূর্য্য-মণ্ডলের ওপারে। তাই মহাজ্ঞান দ্বারা সূর্য্য-মণ্ডল ভেদ হইলে এবং এদিকে পরমা প্রকৃতি ভেদ হইলে মহাকৃপার অন্তিম উন্মেষে অন্তিম দ্বার আপনিই উদ্‌ঘাটিত হয়। তখন এপার ও ওপারের ব্যবধান-কারক ও সংযোজক ভেদ-রেখা

মিটিয়া যায়, ইহকাল ও পরকাল এবং লোক ও লোকোত্তর একই অখণ্ড প্রকাশে প্রকাশিত হয়। এই মহাপ্রকাশে উদয়াস্ত নাই এবং হ্রাস-বৃদ্ধিও নাই, ইহাই তৃতীয় গুরুরাজ্যের বিন্দুর পরিচয়। অখণ্ড গুরুরাজ্যের কেন্দ্র হইতে কর্ম্ম আসিলে কর্ম্ম পূর্ণ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। বর্ত্তমান দেহে কর্ম্ম পূর্ণ না হইলে অলৌকিক দেহে কর্ম্ম পূর্ণ হইবে, এই নিয়ম এখানে কার্য্যকর নহে, কারণ এখানে লৌকিক দেহই লোকোত্তর রূপে পরিণতি লাভ করে। সুতরাং এই তৃতীয় রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইলে অর্থাৎ অন্ততঃ এক জনও যদি এই পূর্ণ অবস্থা কর্ম্মের পূর্ণতার সঙ্গে সঙ্গে নরদেহে প্রাপ্ত হয় তখন আর তাহার কিছুই করণীয় থাকে না—বিশ্ব জগতের প্রতি অণুপরমাণু তাহার সহিত যুক্ত হয় এবং তাহার প্রেরণা লাভ করিয়া অনতিবিলম্বে নিজ কর্ম্মের পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং মধ্য বিন্দুর সহিত তাদাত্ম্য লাভ করে।

(৭)

এইখানে আরও একটি নিগূঢ় সন্ধান দিতে চেষ্টা করিতেছি। গুরুরাজ্যের কেন্দ্রে আমরা যাহাকে পাইয়াছি তিনি অখণ্ড প্রকাশ রূপ, তিনিই শিবতত্ত্ব। অবশ্য এই শিব দেহস্থিত সমস্ত চক্রভেদের পর সহস্রারে অথবা সহস্রারের ঊর্দ্ধে অনন্ত প্রকাশ রূপে প্রকাশমান হন। জ্ঞানগঞ্জ হইতে যে রাজ্যের সূচনা হয় তাহার লক্ষ্য পরমা প্রকৃতি বলিয়া আমরা উল্লেখ করিয়াছি। এই লক্ষ্য প্রাপ্ত হইতে হইলে শিব-ভাবকে পরমশিব-ভাবে পরিণত করা আবশ্যক, কারণ এই পরমাপ্রকৃতি পরম শিবেরই নাভিকুণ্ড হইতে উত্থিত কমলাসনে বিরাজ করিতেছেন। শিবাবস্থায় ইঁহার

আবির্ভাব সম্ভবপর নহে। গুরুরাজ্যের লক্ষ্য যে শিব তাঁহার সহিত শক্তির যোগ সিদ্ধ হইলে ঐ শিব পরমশিবরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। শক্তির পূর্ণ বিকাশ সম্পন্ন হইলে নাভিমার্গ খুলিয়া যায় এবং তখন ঐ নাভিমণ্ডল হইতে ব্রহ্মনাল উত্থিত হয়। ইহা ষট্‌চক্র ভেদনকারী ব্রহ্মনাল হইতে উৎকৃষ্ট, কারণ ইহা শিবের নাভি হইতে উত্থিত হয় এবং ইহারই উপর কমলের কর্ণিকাতে মহাশক্তি বিরাজ করেন। শিব তখন অর্থাৎ পরমশিব তখন নিদ্রিতবৎ অবস্থিত। প্রথম রাজ্যের শিব শবরূপে স্থিত হন, কিন্তু দ্বিতীয় রাজ্যের শিব অর্থাৎ পরমশিব শব না হইলেও সুপ্ত হন (নিমেষ)। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে এই দ্বিতীয় রাজ্যেও পূর্ণত্ব সম্ভবপর নহে। তন্ত্রশাস্ত্রে ষট্‌ত্রিংশৎ তত্ত্বের উপদেশে শিব ভাবের আদর্শ প্রদর্শিত হইলেও ইঙ্গিতে তত্ত্বাতীত পরমশিবের দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু শিবতত্ত্ব হইতে তত্ত্বাতীত পরমশিবে কি প্রকারে উপনীত হওয়া যায় তাহার পথ নির্দ্দেশ করা হয় নাই। তবে প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে যে শিবভাবের মধ্যে শক্তির পূর্ণসত্তা অভিন্ন ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। এইজন্যই শিবভাব প্রকাশাত্মক বলিয়া বিশ্বাতীত হইলেও উহাই পূর্ণত্বের মূল ভিত্তি, কিন্তু শক্তির জাগরণ ব্যতীত ঊর্দ্ধগতি সম্ভবপর নহে। শক্তির কিঞ্চিৎ জাগরণে শিব হন শব, কিন্তু শক্তির আরও অধিক জাগরণে শিব হন সুপ্ত। শক্তির পূর্ণতম জাগরণে শিবও হন পূর্ণ জাগ্রৎ। কালী আদ্যাশক্তি, ইহা শিবময়ীশক্তির জাগরণের প্রথম পর্ব্ব। শিব তখন শব। তারা সন্ধিস্থান - তখনও শিবের শবত্ব পরিহৃত হয় নাই। ললিতা বা রাজরাজেশ্বরী তৃতীয়া শক্তি, ইহার পূর্ণ

জাগরণে শিব হন নিদ্রিত। এবার শবভাব কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু নিদ্রাভাব (নিমেষ) এখনও আছে। জ্ঞানগঞ্জের পরম অবধি এই পর্য্যন্ত। এখনও পূর্ণত্ব অবশিষ্ট। জ্ঞানগঞ্জের সাধনাতে শাস্ত্রের যাহা অস্পষ্ট ইঙ্গিত তাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে। কারণ শিবভাবের পরে পরম-শিবভাব এখানে প্রতিষ্ঠিত।

আমরা জানি শ্রীশ্রীগুরুদেব জ্ঞানগঞ্জের সাধনা পূর্ণ করিবার সময় নাভিধৌতি ক্রিয়া লাভের জন্য কি পরিমাণে উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন এবং কিভাবে উহা শ্রীগুরুর কৃপায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই নাভিধৌতির ফলেই তিনি শিবভাব হইতে পরম শিবভাব পর্য্যন্ত উন্নীত হইয়াছিলেন মনে করা যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে মহাশক্তি রাজরাজেশ্বরীকে নিজেরই নাভি হইতে উত্থিত কমলে আসন দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। উন্মুক্ত নাভিকমলের সঙ্গে নবোদিত জ্ঞানসূর্য্যের গভীর সম্বন্ধ রহিয়াছে। এই সূর্য্য উদিত হইলে নাভিকমল প্রস্ফুটিত হয় ইহাও যেমন সত্য, তেমনি নাভিকমল প্রস্ফুটিত না হইলে এই সূর্য্যের সন্ধান পাওয়া যায় না ইহাও তেমনি সত্য। এই জ্ঞানসূর্য্য মহাজ্ঞানের দ্যোতক। গুরুরাজ্যের কেন্দ্রে যে শিবভাবের স্থাপনা হইয়াছে তাহার পর এই মহাজ্ঞানের সম্ভাবনা। সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করা আবশ্যক, নতুবা সূর্য্যমণ্ডলের পরপারে অবস্থিত অখণ্ড গুরু ব্রহ্ম-তত্ত্বের সাক্ষাৎকার লাভ সুকঠিন। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও সত্য যে পরমা প্রকৃতি অথবা রাজরাজেশ্বরীকেও ভেদ করিতে হইবে। যে অখণ্ড গুরুরাজ্য অথবা তৃতীয় রাজ্যের কথা বলা হইয়াছে তাহার প্রতিষ্ঠার জন্য এই দুইটিই আবশ্যক, শিবের শবত্ব

মুক্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু পরমশিবের সুপ্তিভঙ্গ (নিমেষ ত্যাগ) এখনও হয় নাই। পরমশিবের জাগরণ সিদ্ধ হইলেই পূর্ণ জাগরণ হইল বলা চলে। তখন আর শিব-শক্তি বলিয়া পৃথক্ কিছু থাকিবে না, এক অখণ্ড চৈতন্যই থাকিবে। তবে ইহার মধ্যেও ক্রম আছে, কারণ প্রথমে হয় আনন্দের প্রতিষ্ঠা, তাহার পর হয় বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা, তাহার পর সত্যের প্রতিষ্ঠা।

একটি কথা এখানে প্রণিধানযোগ্য। যোগী কর্ম্মের প্রভাবে অগ্রসর হয় ইহা সত্য, কিন্তু এই কর্ম্মের সঙ্গে কৃপা বা অনুগ্রহের এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে যে চরমাবস্থায় এই দুইটিকে ভেদ করা যায় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে গুরুরাজ্যে গুরুদত্ত প্রাথমিক অনুগ্রহ কর্ম্মের আকারে শিষ্যের জীবনে প্রকাশ পায়, কারণ তাহা না হইলে দীক্ষাপ্রাপ্তির অব্যবহিত পরে মৃত্যু হইলেও শিষ্য গুরুরাজ্যে স্থান পায় কিসের জোরে? আসন-তত্ত্ব একদিকে কৃপা ও অপরদিকে কর্ম্মকে অভেদে ধারণ করিতেছে। গুরুদত্ত আসন ইহাই বুঝায় যে এক পক্ষে ইহা যেমন গুরুর কৃপা, অপর পক্ষে তেমনি শিষ্যের ভাবী-কর্ম্মের সম্ভাবনীয়তা। পরে কর্ম্ম করিতে হয় ইহা সত্য, কিন্তু ইহার সম্ভাবনা আসন ব্যতীত হইত না। যদিও এই কৃপা এক হিসাবে ঋণরূপ, কারণ পরে উহা শিষ্যের কর্মদ্বারা শোধিত হয়, তথাপি ইহা কালরাজ্য হইতে উদ্ধার করিবার অব্যর্থ উপায়। দ্বিতীয় রাজ্যে এই কৃপা যেমন আরও গভীর তেমনি ইহার সংস্পৃষ্ট কর্মের বল ও প্রসারও আরও অধিক। কিন্তু এই দ্বিতীয় রাজ্যেই সব শেষ হয় না, কারণ এখানেও

কর্ম বাকী রহিয়াছে এবং কৃপাও অবশিষ্ট রহিয়াছে। কৃপা ও কর্মের মিলন এখনও হয় নাই। এখনও গুরুর কৃপা ও শিষ্যের কর্ম কতকটা পৃথক্ পৃথক্ই বিদ্যমান আছে, যদিও উভয়ে অনেকটা মিলন সংঘটিত হইয়াছে। পরমা প্রকৃতির রাজ্যের শেষ সীমা পর্য্যন্ত কৃপার অবধি। সেই পর্য্যন্ত যে কর্ম তাহা কৃপার অধীন অর্থাৎ স্পষ্ট কৃপার অধীন। কিন্তু পরমা প্রকৃতির রাজ্য ভেদ করা, অখণ্ড গুরুধামে প্রবেশ করা এবং সর্ব্বপ্রথমে শিবাবস্থা হইতে ঊর্দ্ধে উত্থিত হওয়া, সবই মহাকৃপা সাপেক্ষ, কিন্তু ইহা গুপ্ত। ইহা অজানাভাবে ঘটিয়া থাকে, কিন্তু কৃপার কার্য্য সিদ্ধ হয়। কৃপারূপে কৃপার পরিচয় পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু কৃপা নিজ ফল প্রসব করে। পরমা প্রকৃতির রাজ্য-ভেদের পর অখণ্ড গুরুধামের দ্বার পর্য্যন্ত পথ অত্যন্ত দুর্গম। এই পথে কৃপার অর্থাৎ প্রকট কৃপার সন্ধান পাওয়া যায় না। তৃষ্ণার্থ পথিক পিপাসায় আর্ত্ত হইয়া কাঁদিতে থাকে। তৃষ্ণানিবর্ত্তক জল অর্পণ করিবার জন্য কেহ তাহার নিকট হাত বাড়াইয়া দেয় না। কিন্তু তাহা না দিলেও অজ্ঞাতভাবে অচিন্ত্য প্রকারে তাহার তৃষ্ণার উৎকটতা কমিয়া আসে এবং কষ্টেরও লাঘব হইতে থাকে।

(৮)

সাধকের কুণ্ডলিনী জাগরণের পূর্ণ পরিণতি চিদাকাশে ইষ্ট বা মা'র সহিত তাদাত্ম্য। উদ্বৃত্ত শক্তির অভাববশতঃ সাধক যোগী হইতে পারে না। খণ্ডযোগীর কুণ্ডলিনী জাগরণের চরম ফল শুদ্ধ বিদ্যার উন্মেষ ও উহার বিকাশে শিবত্ব লাভ। এইখানেই জীবের

জীবভাব কাটিয়া শিবভাব প্রাপ্তি ঘটে। সাধক শিব হইতে পারে না, কিন্তু কেবলী হয় অর্থাৎ বিদেহ-কেবলী। ইহা নিরঞ্জন পশুরই একটি অবস্থা। যোগী খণ্ড হইলেও কর্মের পূর্ণতায় শিব হয়, জীবভাব আর থাকে না, বিদেহও হয় না—সিদ্ধ খণ্ডযোগী হয় ও তাহার কায়া হয় শাক্ত। গুরুরাজ্যে সর্ব্বত্র বৈন্দব কায়া, কিন্তু জ্ঞানগঞ্জের অধোদিকে বৈন্দব কায়া এবং ঊর্দ্ধে শাক্ত কায়া। বৈন্দব কায়া অমর, শাক্ত কায়াও অমর, কিন্তু বৈন্দব কায়াতে পূর্ব্ব কাল-সম্বন্ধ সংস্কাররূপে থাকা পর্য্যন্ত জরা থাকিলেও মৃত্যু থাকে না, কিন্তু শাক্ত কায়াতে জরাও থাকে না। উহা অজর ও অমর, উহাই শ্রেষ্ঠ দিব্যকায়া। দিব্যজ্ঞান ব্যতীত দিব্যকায়ার উদ্ভব হয় না। শুষ্কজ্ঞানে মায়িক কায়ার নিবৃত্তি হয় বটে এবং কর্মবীজ নষ্ট হয় তাহাও সত্য, কিন্তু শুদ্ধ বিদ্যার অভাবে অমায়িক কায়া লাভ হয় না। জ্ঞানগঞ্জের ঊর্দ্ধদিকে সকলেই স্বরূপতঃ কিশোর কিশোরী—সকলেরই স্থিতি শিবত্বরূপ মহাপ্রকাশে। ভৈরবী অবস্থাতে জরা থাকে, কিন্তু দেবী অবস্থাতে জরা থাকে না।

গুরুরাজ্যের সাধনা জীবের সাধনা শিব হওয়ার জন্য, কিন্তু জ্ঞানগঞ্জের সাধনা শিবের সাধনা পরমশিব হওয়ার জন্য অর্থাৎ নিজের আধারে পরাশক্তির পূর্ণতম বিকাশের জন্য। গুরুরাজ্যের সাধনায় যে ষট্‌চক্রের ভেদ হয় তাহা জীবদেহের ষট্‌চক্র, কিন্তু জ্ঞানগঞ্জের সাধনায় উক্ত ষট্‌চক্র ভেদ করিতে হয় না এবং শিবত্ব লাভের সঙ্গে সঙ্গে সে প্রয়োজনও আর থাকে না। কিন্তু শিবত্ব লাভ হইলেই ত সব হইল না। কারণ শিবত্বে যদি শক্তি

অন্তর্লীন থাকে তাহা হইলে শক্তির কোন ক্রিয়া থাকে না বলিয়া শিবও অব্যক্তপ্রায় হইয়া যান। এই শিব বিশ্বাতীত মহাপ্রকাশের সহিত অভিন্ন। শিবের সঙ্গে তাঁহার নিজশক্তির পূর্ণ সংযোগ হইলে সামরস্য ভাবের উদয় হয়। পূর্ব্বে হইয়াছিল শিবের জাগরণ, এবার হইল শিবের পূর্ণ শিবত্ব লাভের সঙ্গে সঙ্গে শক্তির জাগরণ। ইহার পর হইবে এমন একটি অবস্থার উদয় যেখানে জাগ্রৎ শিব ও জাগ্রৎ শক্তি অভিন্ন হইয়া প্রকাশমান হইবেন। তখন শিবের মহানিদ্রা-ভঙ্গ হইবে এবং পরমশিব পৃথক্ সত্তা নিয়া থাকিবেন না—পূর্ণ অদ্বৈত সত্তার উদয় হইবে। কিন্তু সূর্য্যমণ্ডল ভেদ না হওয়া পর্য্যন্ত এইরূপ স্থিতি হওয়া সম্ভবপর নহে। সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিতে পারিলে অন্তরালবর্ত্তী সকল পর্দ্দা কাটিয়া যায়, অখণ্ড গুরুরাজ্যের প্রকাশ তখনই সম্ভবপর। জ্ঞানগঞ্জের সাধনা ও সিদ্ধি এই অখণ্ড ভূমিরই প্রাপ্তির সহায়ক।

(৯)

জ্ঞানগঞ্জের অথবা গুরুরাজ্যের আলোচনা প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন স্বভাবতঃই জিজ্ঞাসুর মনে উদিত হইয়া থাকে। প্রশ্নটি এই—কেহ শুষ্কজ্ঞান লাভ করিয়া প্রকৃতি হইতে বিবেক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে কৈবল্য লাভ করেন, আবার কেহ দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া ঐ জ্ঞানের ক্রমিক উৎকর্ষে গুরুরাজ্য অথবা জ্ঞানগঞ্জ প্রভৃতি ভূমিতে প্রবেশ করিতে সমর্থ হন। সদ্‌গুরুর অনুগ্রহের মূলে এই প্রকার পার্থক্য লক্ষিত হয় কেন? এই প্রশ্নের উত্তর এই :—সদ্‌গুরু এক হিসাবে অখণ্ড বিশ্ব-গুরু তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু যে আধারে তাঁহার শক্তি সঞ্চারিত হয় তাহার ধারণ-সামর্থ্যের তারতম্যানুসারে

সঞ্চারিত শক্তির তারতম্য ঘটে। এইজন্য অনুগ্রহের প্রকাশে পার্থক্য অনুভূত হয়। বস্তুতঃ তাঁহার কোন পক্ষপাত নাই। আধার-সামর্থ্যের তারতম্যের কারণ এই যে সকলে অবতরণ-মুখে একই স্থান হইতে অবতীর্ণ হয় না। কেহ জ্যোতি হইতেই মায়াতে বিসৃষ্ট হয়—অবশ্য অণুরূপে জ্যোতির মধ্যে পূর্ব্বেই স্থিতিলাভ করিয়াছিল, কেহ জ্যোতির অতীত চিন্ময় রাজ্য হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে। এই চিন্ময় রাজ্যেরও ইতর-বিশেষ আছে, মূলে সব সেই অখণ্ড চৈতন্যেরই শক্তি-স্পন্দন হইতে উদ্ভূত তাহা সত্য। এইজন্য ফিরিবার সময় যে যেখান হইতে নামিয়া আসিয়াছে তাহাকে সেইখানে টানিয়া লওয়া হয়। যে জ্যোতি হইতে সুপ্ত অবস্থার ভঙ্গে মায়াগর্ভে পতিত হইয়াছে—অবশ্য কর্ম্ম-সমষ্টির ভিতর দিয়া,—সংসারে প্রবিষ্ট হইবার পরে তাহার পক্ষে শুষ্কজ্ঞান লাভ করিয়া প্রকৃতির বাহিরে শুদ্ধ বোধ-স্বরূপে স্থিত হওয়াই মুক্তিপদ, ইহার বেশী আকাঙ্ক্ষা সে করিতে পারে না। আপাততঃ উহা তাহার প্রাপ্যও নহে। অনাত্মাতে আত্মবোধ নিবৃত্ত হইলে কর্ম্মবীজ স্বভাবতঃই বিনষ্ট হয়। তখন জন্ম-মৃত্যুর কারণ কাটিয়া যায় এবং কৈবল্য-পদে অবস্থান ঘটে। এই সব আত্মার পক্ষে দিব্যজ্ঞান প্রাপ্তির সম্ভাবনা কোথায়? কিন্তু যে আত্মা চিন্ময় ভূমি হইতে নামিয়া আসিয়াছে তাহার পক্ষে ফিরিয়া যাইতে হইলে জ্যোতি ভেদ করিয়া চিন্ময় রাজ্যে যাওয়া আবশ্যক। এই অবস্থায় শুধু অনাত্মাতে আত্মবোধের নিবৃত্তি যথেষ্ট নহে, আত্মাতে আত্মবোধের উদয়ও আবশ্যক। এই আত্মবোধ যেমন যেমন বিকাশ প্রাপ্ত হয়, তেমনি-তেমনি আত্মাতে অনাত্মবোধও

কাটিয়া আসে অর্থাৎ শুদ্ধ অহংভাব বাড়িতে থাকে এবং ইদংভাব কাটিতে থাকে। চরমাবস্থায় শুদ্ধ আত্মাতে পূর্ণ অহংভাব বিরাজ করে। ইহাই শিবত্ব। এইভাবে গুরুরাজ্যের ঊর্দ্ধ সীমা পর্য্যন্ত গতির প্রণালী গুহ্যভাবে হইলেও তান্ত্রিক সাহিত্যে প্রকাশ করা হইয়াছে। কিন্তু গুরুরাজ্য হইতে জ্ঞানগঞ্জে উঠিবার প্রণালী কোথাও বর্ণিত হয় নাই, কারণ ইহা আরও গুহ্য। জ্ঞানগঞ্জে সেই সব আত্মাই প্রত্যাবর্ত্তন করে যাহারা ঐ ভূমি হইতে প্রপঞ্চে নামিয়া আসিয়াছে। মহাখণ্ড গুরু বাছিয়া বাছিয়া তাহাদিগকে টানিয়া নেন। কারণ তাহাদের জ্ঞানগঞ্জে ফিরিবার স্বাভাবিক প্রবণতা রহিয়াছে। এই পর্য্যন্তই আমাদের আলোচনার বর্ত্তমান সীমা। কিন্তু এই নীতির অনুসরণ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে অখণ্ড গুরুরাজ্যেও অধিকার অনুসারে গতি হইয়া থাকে।

প্রত্যেক রাজ্যেই দুইটি বিভাগ আছে। একটি কেন্দ্র, অপরটি বাহ্য। কেন্দ্রের বল কম হইলে তাহার অধিকার-ক্ষেত্ররূপ গোলকটি ছোট হয়। কেন্দ্রের বল বেশী হইলে ঐ ক্ষেত্রটি আরও বড় হয়। কেন্দ্রের বল অপরিসীম হইলে ঐ ক্ষেত্রটি ফলতঃ বিশ্বব্যাপী, এমন কি অনন্ত হইয়া পরে। কেন্দ্রের শক্তি প্রবল হইলে কেন্দ্রে প্রবেশ করিবার অধিকারীর সংখ্যা খুব কম হয়, কিন্তু কেন্দ্র প্রবল বলিয়া কৃপা-বিস্তারের ক্ষেত্রটা অপরিসীম বৃহৎ হয়। যতই নামিয়া আসা যায় ততই কেন্দ্র হয় দুর্ব্বল, তাই কৃপা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু নিয়ন্ত্রণাদির বন্ধন থাকিয়া যায়। কেন্দ্র আরও দুর্ব্বল হইলে অনুগ্রহের ক্ষেত্র [illegible]চত হয় বলিয়া নিয়ম ও বিধান অপেক্ষাকৃত কঠিন হয়।

কারণ তাহা না হইলে শুধু দুর্ব্বল কেন্দ্র দ্বারা ফল-সম্পাদন সম্ভবপর নহে।

এইজন্য অখণ্ড গুরুর দৃষ্টিতে তাঁহার অনুগ্রহের অযোগ্য বা অবিষয়ীভূত কেহই থাকিতে পারে না।

(১০)

জ্ঞানগঞ্জ সম্বন্ধে মোটামুটি কিছু তত্ত্ব প্রকাশ করা হইল। কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে জ্ঞানগঞ্জ এবং তদনুরূপ অন্য স্থান (যেমন বৃন্দাবন), এই উভয়ে পার্থক্য কি? জ্ঞানগঞ্জ বলিতে আমরা তিব্বতের অন্তর্ব্বর্ত্তী নিগূঢ় স্থান-বিশেষকে লক্ষ্য করিতেছি না, যদিও ইহা সত্য যে ঐ স্থানও প্রকৃত জ্ঞানগঞ্জের সহিত সংসৃষ্ট, কারণ তত্ত্বময় জ্ঞানগঞ্জেরই উহা অর্থময় প্রকাশ। তদ্রূপ বৃন্দাবন বলিতেও আমরা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের অন্তর্গত মথুরার সন্নিহিত স্থান-বিশেষকে লক্ষ্য করিতেছি না, যদিও এই ক্ষেত্রেও ইহা সত্য যে এই ভৌম বৃন্দাবনের সহিতও প্রকৃত বৃন্দাবনের সংসর্গ রহিয়াছে, এমন কি তাদাত্ম্যও রহিয়াছে।

বৃন্দাবন মাধুর্য্যময়ী ভক্তি-সাধনার শ্রেষ্ঠ স্থান। জ্ঞানগঞ্জ কর্ম্মভূমি, পৃথিবীতে পার্থিব দেহে আরব্ধ কর্ম্ম ঐখানে পূর্ণ হইতে পারে, দেহাদির সংস্থান তাহার অনুকূল ভাবেই সেখানে পাওয়া যায় এবং ঐ কর্ম্ম পূর্ণ হইলে যে লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যাইবে তাহাও ঐখান হইতেই আভাসরূপে দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু বৃন্দাবন এই জাতীয় কর্ম্মস্থান নহে, কিন্তু ভাবস্থান। ভাব-সাধনা এইখানে আরব্ধ হইয়া অসম্পূর্ণ থাকিয়া গেলে বৃন্দাবনে তদুপযোগী দেহ প্রাপ্তি হয় এবং এই সাধনার ক্রম-বিকাশ চলিতে

থাকে, কারণ ওখানেও স্তর-বিভাগ আছে। জ্ঞানগঞ্জে যেমন অভিনব দেহাদি প্রাপ্তি ঘটে, যাহার চরম লক্ষ্য জরা ও মৃত্যু হইতে অব্যাহতি, বৃন্দাবনেও তেমনি ভগবানের বহিরঙ্গ বা অন্তরঙ্গ সাধনার উপযোগী ভাব-দেহের প্রাপ্তি ঘটে এবং ঐ ভাব-দেহের ক্রম-বিকাশে কোন না কোন সময় পূর্ণ রসের অভিব্যক্তি হয় এবং চরম সিদ্ধিলাভ হয়। জ্ঞানগঞ্জে দিবারাত্রি বিভাগ নাই, বৃন্দাবনেও তাহাই। জ্ঞানগঞ্জের ভূমি মৃত্তিকারূপ নহে, তদ্রূপ বৃন্দাবনের ভূমিও মৃত্তিকারূপ নহে, উভয়ই চিন্ময়। ইহা সত্ত্বেও উভয়ে ভেদ আছে। জ্ঞানগঞ্জের লক্ষ্য 'মা', যাহাকে পাইবার জন্য শিবকে নাভি-ধৌতি সিদ্ধ করিয়া পরমশিবরূপ ধারণ করিতে হয়। বৃন্দাবনের লক্ষ্য 'মা' নহে, বৃন্দাবনে মায়ের কোন স্থান নাই। এমন কি জ্ঞানগঞ্জের যিনি পরম লক্ষ্য রাজরাজেশ্বরী বা ললিতা বৃন্দাবনে তিনি মাতৃরূপ পরিহার করিয়া রসলীলার প্রধান সখীরূপে পরিগণিত। ইহার অতি নিগূঢ় তাৎপর্য্য আছে। শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীগুরুর ধারা জ্ঞানগঞ্জ হইতে মাকে ধরিয়া অনন্তের দিকে অগ্রসর হইয়াছে, কিন্তু গুরুদেবের শ্রীগুরুর গুরুভ্রাতা শ্রীল ভবদেব গোস্বামীর ধারা মাকে পরিহার করিয়া কান্ত ভাব ধরিয়া যুগল উপাসনায় পর্য্যবসিত হইয়াছে।

আলমন্দার সংহিতাতে আছে ভগবানের লীলা তিন প্রকার— একটি বাস্তব বা পারমার্থিক, একটি প্রাতিভাসিক এবং একটি ব্যাবহারিক। বেদান্তে যেমন সত্তাকে পারমার্থিক, প্রাতিভাসিক ও ব্যাবহারিক এই তিন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে, বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণের শাস্ত্রে যেমন স্বভাবকে পরিনিষ্পন্ন, পরিকল্পিত ও

পরতন্ত্র এই তিন ভাগে বিভাগ করা হইয়াছে, তেমনি বৈষ্ণবগণও লীলাকে তিন ভাগে বিভাগ করিয়াছেন। এই ত্রিবিধ লীলার স্থানও তিন প্রকার—বাস্তব বা পারমার্থিক লীলা অক্ষর ব্রহ্মের হৃদয়-প্রদেশে দৃষ্ট হয়, প্রাতিভাসিক লীলা নিত্য বৃন্দাবনে হইয়া থাকে এবং ব্যাবহারিক লীলা নির্দ্দিষ্ট সময়ে ব্রজভূমিতে হইয়া থাকে। মনে রাখিতে হইবে, অক্ষর ব্রহ্মের হৃদয়টি বৃন্দাবন, প্রাতিভাসিক লীলার যেটি ভূমি তাহাও বৃন্দাবন এবং ব্রজভূমিও বৃন্দাবনেরই নামান্তর। কিন্তু তিনটিই বৃন্দাবন হইলেও ইহাদের মধ্যে পরস্পর পার্থক্য আছে। অনুরূপ যুক্তি ও পরিভাষা অবলম্বন করিয়া বলিতে পারা যায় যে জ্ঞানগঞ্জের মধ্যেও এই প্রকার ভেদ আছে। যেটি প্রকৃত জ্ঞানগঞ্জ সেটি ঐ অক্ষর ব্রহ্মের হৃদয়স্থ বৃন্দাবনের মতই চিন্ময় প্রদেশ। ঐ বৃন্দাবন যেমন –

তৎস্থানং কোটি-ব্রহ্মাণ্ড-মহাশূন্যাদ্ বিলক্ষণম্।
মানং তস্যাপি কিমপি বিদ্যতে নৈব শাম্ভবি॥
তত্র ভুমিং স্বপ্রকাশামাকাশঞ্চ তথাবিধম্।
জলং তথাবিধং বিদ্ধি তেজশ্চৈব তথাবিধম্, ইত্যাদি॥

তদ্রূপ বাস্তব জ্ঞানগঞ্জের ভূমি আকাশ জল তেজ সবই স্বপ্রকাশ, অর্থাৎ সেখানে মাটি নাই, আকাশ প্রভৃতিও নাই, একমাত্র চৈতন্যই ভূমি প্রভৃতি রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। যেটি ব্যাবহারিক জ্ঞানগঞ্জ সেইটি সিদ্ধ পুরুষ প্রভৃতির পরিচিত, কিন্তু যেটি পারমার্থিক জ্ঞানগঞ্জ সেটি যোগের চরম শিখরে উত্থিত না হইলে উপলব্ধি করা যায় না। তাই বলা হয় তিব্বতের স্থান

বিশেষে জ্ঞানগঞ্জ অবস্থিত, যেখানে অধিষ্ঠাতৃ বর্গের সহানুভূতি না থাকিলে প্রবেশ করা যায় না, এমন কি সে স্থানের সন্ধানও পাওয়া যায় না।

কর্ম্মের সার্থকতা এবং ভক্তির সার্থকতা সাধকের জীবনে পৃথক্ পৃথক্। কর্ম্ম দ্বারা অধিকার-সম্পত্তি প্রবল হইলে উক্ত স্থান সকলের সন্ধান পাইতে পারা যায়। এই অধিকার-সম্পত্তি লাভের জন্য স্থূলদেহে গুরু-নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মরাশিকে সমাপ্ত করিতে হয়—আভাসও যেন বাকী না থাকে। কর্ম্ম সমাপ্ত না হইলে আধারে বলাধান হয় না, স্বরূপের মহান্ প্রকাশ ধারণা করিবার যোগ্যতা জন্মে না। কৃপা ধারণ করিতে হইলেও যোগ্যতা আবশ্যক। মহাকৃপাই প্রকৃত কৃপা, তখনকার যোগ্যতাই শ্রেষ্ঠ যোগ্যতা। জ্ঞানগঞ্জে, শুধু জ্ঞানগঞ্জে কেন প্রতি যোগ-ভূমিতেই, এই যোগ্যতা বাড়াইবার উপায় রহিয়াছে। ইহার ফলে কর্ম্ম ক্রমশঃ পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতে পারে। এইজন্য গুরুরাজ্য, জ্ঞানগঞ্জ এবং অখণ্ড গুরুর ক্ষেত্র, যাহা ভাবী প্রকাশের অন্তর্গত, সবই ভূমিরূপ। পারমার্থিক জ্ঞানগঞ্জের সন্ধান সকলের পক্ষে জানা সম্ভবপর নহে। তবে কেহ কেহ যে জ্ঞানগঞ্জের সন্ধান প্রাপ্ত হন বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায় তাহা ব্যাবহারিক জ্ঞানগঞ্জের সঙ্গেই সংসৃষ্ট জানিতে হইবে।*

---

* জ্ঞানগঞ্জের বিবরণ "শ্রীশ্রীযোগিরাজাধিরাজ বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস" নামক গ্রন্থের বিভিন্ন পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। "ব্রহ্মাণ্ড নো ভেদ" নামক ১৯২৬ সনের প্রকাশিত গুজরাতী গ্রন্থে যে তিব্বতে অবস্থিত "সত্য জ্ঞানাশ্রম" বা "জ্ঞানমঠ" নামক গুপ্ত মঠের কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা

জ্ঞানগঞ্জের সহিত সংস্পৃষ্ট বলিয়া মনে হয়। এই মঠ হিমালয়ের উপরে, তিব্বত প্রান্তে অবস্থিত। ইহার পাঁচ মাইল ব্যবধানে চিরতুষার প্রদেশ। এই মঠে যে প্রকার জ্ঞান পাওয়া যায় তাহার তুলনা পৃথিবীতে আর কোন স্থানে নাই। প্রসিদ্ধ আছে যে রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজ্যকালে সিদ্ধপুরী, আত্মপুরী ও জ্ঞানপুরী নামক তিনজন পর্য্যটক ভ্রমণ করিতে করিতে ব্রহ্মদেশে কিছুদিন অবস্থানের পর এই গুপ্তস্থানে আসিয়া স্থায়ী ভাবে বাস করিতে আরম্ভ করেন। এখানে যোগ, অমৃতসিদ্ধি ও অন্যান্য বিজ্ঞান বিষয়ক তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা হইত। স্থানটি এত গুপ্ত যে সুদীর্ঘ কালেও চীন, ব্রহ্মদেশ ও আসামের বার জন ব্যতীত আর কেহ এই স্থানের সন্ধান জানিত না। কিছুদিন পরে দুইজন মহাত্মা ঐ স্থান ত্যাগ করেন (ঐ পৃঃ ৭৭)। রোমদেশীয় একজন পথিকও এই স্থানের কথা "জ্ঞানমঠ" নামে প্রকাশ করিয়াছিলেন। এখানকার তিনজন মহাপুরুষের অলৌকিক দিব্যশক্তির কথা বর্ণিত হইয়াছে। এই মঠে অনুমতি ব্যতীত কাহারও প্রবেশ করিবার উপায় ছিল না (ঐ পৃঃ ৭৮)। আর একজন গ্রীক পর্য্যটকও এই স্থানের কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন যে তিব্বতের এই মঠের ন্যায় অদ্ভুত স্থান তিনি পৃথিবীতে অন্যত্র দেখেন নাই। তাঁহার মতে ইহাই প্রকৃত "Heaven on Earth" (ভূ-স্বর্গ) (ঐ পৃঃ ৭৮)। চীনদেশের ঐতিহাসিক বিদ্বান্ Fengliyan বলিয়াছেন যে দুর্গম পর্ব্বতের অন্তরালে এই গুপ্ত মঠে যোগক্রিয়ার যে আলোচনা হয় তাহা অনেকেই জানে না, কিন্তু ইহা মনে হয় যে এক সময় পৃথিবীর প্রকৃত উন্নতি এই সব যোগীদের দ্বারাই সিদ্ধ হইবে। এই সকল যোগী যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই করিতে পারেন। আর একজন ঐতিহাসিক বলিয়াছেন যে বায়ুমণ্ডলে একটি অদৃশ্য দুর্গ রচনা করিয়া জ্ঞানমঠকে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে (ঐ পৃঃ ৭৯)।

"দেবদর্শন" প্রথম খণ্ডে আছে যে অনন্ত যোগী নামক একজন মহারাষ্ট্র যোগী ভগবান্ দত্তাত্রেয়ের আদেশে যোগ শিক্ষার জন্য জ্ঞানগঞ্জ গিয়াছিলেন ও সেখানে কয়েক বৎসর বাস করিয়াছিলেন। "জ্ঞানগঞ্জ" নামক আমার একটি বিবরণাত্মক প্রবন্ধ গোরখপুর হইতে প্রকাশিত "কল্যাণ" নামক মাসিক পত্রিকার যোগাঙ্কে বহুদিন পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, উহা ব্যাবহারিক জ্ঞানগঞ্জের বিবরণ।

শ্রীশ্রী৺গুরুদেব স্মরণে

শ্রীমুনীন্দ্রমোহন কবিরাজ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৪)

১। বহুদিনের কথা—সেবারে শ্রীশ্রীচরণ দর্শন জন্য ধানবাদে হরি-মন্দিরের নিকটে জগদীশ দাদা (বরাকরের ষ্টেশন মাষ্টার) যে বাড়ী করিয়াছিলেন সেই বাড়ীতে যাই। সকালে শ্রীশ্রীবাবা পূজাগৃহ হইতে বাহির হইয়া এক ঘণ্টা পাহাড়-জঙ্গলের দিকে বেড়াইতে যাইতেন। তিনি এত দ্রুত চলিতেন যে উপস্থিত গুরুভাইদের কেহ সঙ্গে যাইতে পারিতেন না ; অবশ্য শ্রীবাবা কতকদূর গিয়া দাঁড়াইলে সকলে তাড়াতাড়ি গিয়া সঙ্গ লইতেন। আমিও সঙ্গে আছি, কিন্তু দৌড়িতে হইতেছে। পাহাড়ের নীচে জলাভূমিতে কতকগুলি ছোট ছোট ফুলসহ চারা দেখাইয়া আমাকে বলিলেন, "চেন কি গাছ ?" "না, বাবা, জানি না।" "চিনে রাখ, বহুলোকের উপকার হইবে। ইহার শিকড় বা শিকড়সহ সমস্ত গাছ সিল্কের মধ্যে মুড়িয়া বাঁধিয়া সিল্ক সূতায় শনিবার বা মঙ্গলবারে সকালে হিষ্টিরিয়া রোগীর গলায় ঝুলাইয়া রাখিবে এবং পর শনি মঙ্গলবারে সিল্ক বা ঔষধ ও সূতা একটি তামার মাদুলিতে ধারণ করিতে উপদেশ দিবে। প্যাঁয়াজ, রসুন, ডিম ও মদ্য সংস্রব নিষেধ।" শুনিয়াই মনটা আনন্দে ভরিয়া

গেল এবং বলিলাম, "গুরুভাই ইছাপুরনিবাসী গোষ্ঠবিহারী চক্রবর্ত্তীর স্ত্রীর হিষ্টিরিয়ার জন্য আপনাকে বলিতে বলিয়াছিল, আমি সুযোগ খুঁজিতেছিলাম বলিবার জন্য। দয়াময় ঠাকুর! মেঘ না চাইতেই জল। আপনার অসীম দয়া।" সেই অবধি বহু রোগীকে দিয়াছি, সকলে ভালও হইয়াছে, আবার প্যাঁয়াজ, রসুন সংশ্রবমাত্রেই রোগ জানাইয়াছে। বলিয়াছিলেন "কোন অর্থ বা উপকার প্রত্যাশা করা চলিবে না। আরোগ্য হইলে বণ্ডুলেশ্বর শিবের মানসিক পাঠাইতে বলিও।"

২। সেবারে শ্রীশ্রীবাবা শুন্নুড়ীতে গৌরীচরণ রায় ও হরিশ রায় দাদার বাড়ীতে শুভাগমন করিয়াছেন, আমরাও গিয়াছি। সীতারাম মিশ্র গায়ক দাদাও গিয়াছিলেন, তিনি একদিন পরেই ফিরিয়া যান। আমি কয়েকদিনই ছিলাম। শ্রীশ্রীবাবাকে নিয়া যাবেন বলিয়া দাদা বাগানে একটি একতালা বাড়ী করিয়াছিলেন। বাড়ী তাঁদের দোতালা, বৈশিষ্ট্য Lightning Conductorটি এক বৃহৎ শিবমূর্ত্তির হাতে ত্রিশূল। ট্রেন থেকে দূর হইতে দেখা যায়। বাবা সকালে বেড়াইতে বাহির হইলেন, সঙ্গে ছিলাম মাত্র আমি। একটি গাছ দেখাইয়া বলিলেন, "চিনিতে পার কি? কি উপকার হয় জান?" গাছটি চিনিতাম, যাহা উপকার হয় বলিলাম। বলিলেন, "শিখিয়া রাখ, বহুলোকের উপকার হইবে। হাঁপানী রোগীকে রবিবার দিন একুশটি মরিচ ও গঙ্গাজল দিয়া এক তোলা ওজনের শিকড়, বাঁটিয়া খালি পেটে খাইতে দিবে। সাধ্যমত মানসিক করিবে ও আরোগ্য হইলে মানসিকের টাকা শ্রীশ্রী৺বণ্ডুলেশ্বর শিবের সেবাইতের নিকট পাঠাইতে ঠিকানা দিবে

পঁ্যায়াজ, রশুন, ডিম, মদ্য এবং তামাক (যে কোন প্রকারের) নিষেধ।” যাহারা প্রকৃতপক্ষে বেশ ভুগিয়া কাতর তাহারাই সযত্নে নিয়ম পালন করে। একবার সেবনে, কেহ দুইবার সেবনে আরোগ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঐখানে ঐভাবে সর্পবিষ নিবারক ঔষধটিও সাধারণের উপকারের জন্য শিখাইয়াছিলেন। উহা দ্বারা বহু রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে। দেখা গিয়াছে পেটে থাকিলে নিশ্চয় আরোগ্য। দুই একটির পেটে পড়িবামাত্র বমি হইয়াছে—পুনঃ পুনঃ প্রয়োগেও পেটে না থাকায় সেই রোগীর মৃত্যু হইয়াছে।

৩। শ্রীশ্রীবাবা একবার শীতকালে গোমোতে শ্রীযুক্ত প্রবোধ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দাদার বাড়ীতে পদার্পণ করিয়াছেন। বাড়ীটি কম্পাউণ্ডযুক্ত বাগান-বাড়ী—পেয়ারা গাছ কতকগুলি আছে। ষ্টেশন হইতে দক্ষিণ দিকে দশ বার মিনিটের রাস্তা, ডাঙ্গার উপর, দু পাশে ঝোঁপ। বিকালে পৌঁছিয়াই শ্রীচরণ দর্শনপূর্ব্বক প্রণাম করিলাম। রোহিণীকুমার চেল দাদা সেখানে আছেন। একটু পরে পূজনীয় শ্রীযুক্ত দুর্গাদাদার সঙ্গে দেখা হইল, প্রণাম করিলাম এবং যে ঘরে তিনি ও রোহিণী দাদা ছিলেন, সেই ঘরেই আমার থাকার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। বিছানাদি পাতিয়া ফেলিলাম। রোহিণী দাদা তামাক খাইতেন, আমিও তামাকখোর। বাহিরে আসিয়া অন্তরালে তামাক চলিতে চলিতে রোহিণী দাদা বলিলেন, “পরশু এসেছি।” শুনিতে শুনিতে রোমাঞ্চ হইতেছিল। “একবার কিছুদিন পূর্ব্বে আমার বৈবাহিকের সঙ্গে (ঠিক মনে নাই, সম্ভবতঃ কন্যা উমাদিদির শ্বশুর) শ্রীগুরুদেবের প্রসঙ্গক্রমে অনেক কথার পর

বিজ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তির ব্যাখ্যা করিতে করিতে এক গ্লাস জলে হাত ডুবাইয়া দিয়া বলিলাম, 'এই গোলাপ জল হইয়া গেল।' অমনি প্রবল গোলাপের গন্ধ, জলটাও গোলাপ গন্ধ হইয়া গেল। সকলে দেখিয়া বুঝিল যে আমার শক্তি হইয়াছে। আমারও প্রথমে না হলেও পরে আনন্দ হইয়াছিল—তবে ত আমার কিছু হয়েছে। বৈবাহিকের আহারাদি শেষে দোকানের কাজ শেষ করিয়া আহ্নিক করিতে গেলাম। নিয়মিত আহ্নিক শেষ করিয়া প্রণাম করিতেছি, অমনি শ্রীশ্রীবাবা পিঠে মেরুদণ্ডের উপর সখড়ম প্রহার করিয়া বলিলেন, 'তোমার এক বৎসরের ক্রিয়া ধ্বংস করিলাম।' অজ্ঞান হইয়া প্রায় তিন ঘণ্টা পড়িয়া থাকিবার পর চৈতন্য হইলে সঙ্কল্প করিলাম, বুঝি না কি অপরাধ করিলাম! ভাবিলাম এক বৎসর ডবল ক্রিয়া করিয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত ক্রিয়া পূরণ করিয়া শ্রীশ্রীচরণ দর্শন করিব। শ্রীশ্রীবাবা কলিকাতাতে থাকাকালীন (কয়েক মিনিটের পথ মাত্র) প্রতিজ্ঞা পূরণ না হওয়ায় যাই নাই, যদিও মন ব্যাকুল হইত। গত পরশ্ব পূরণ করিয়া চাকরকে দিয়া বিছানা ষ্টেশনে পাঠাই ও নিজে গাড়ী করিয়া গঙ্গাস্নানান্তে না খাইয়া ট্রেণে উঠি ও বিকালে পৌছিয়া শ্রীচরণ দর্শন ও প্রণামের পর জলযোগ করিয়াছি।" এরূপ অধ্যবসায় না হলে কি তাঁর কৃপা লাভ হয়?

এই ভাবে দুই তিন দিন ছিলাম ও শ্রীশ্রীবাবার সঙ্গে সকাল বিকাল জঙ্গল পাহাড়ে বেড়াইতে যাইতাম। কেহ আসিতেছেন, কেহ যাইতেছেন, প্রবোধ দাদার বা তাঁদের মিলিত ফণ্ডের খবর জানি না। বেশ আনন্দেই ছিলাম। দ্বাদশীর প্রাতে শ্রীবাবা আহ্নিকের ঘর হইতে বাহির হইতেছেন, দেখিলাম ছট্‌ছট্‌ করিয়া

স্ফটিক পড়িতেছে। পাঁচ সাতটি তুলিয়া দিলাম। লইয়া নিজে হাতে টিপিয়া ঢুকাইয়া লইলেন এবং দুই চারিটি আরও চামড়া ফাটাইয়া বাহির হইতেছিল অথচ রক্তপাত হয় নাই। টিপিয়া ঢুকাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, "কাল একাদশী গেছে—শরীরটা বেশ গরম হওয়ার জন্যই বাহির হইতেছে।" গোমো অঞ্চলে বহু ধাতকী পুষ্প গাছ আছে, এমন কি জঙ্গল। লাল লাল ফুল, মধুপূর্ণ বোঁটা। "জান এ গাছ কি ?" "হাঁ বাবা, ধাতকী পুষ্প বা ধাই ফুল।" শ্রীবাবা বলিলেন, "হকিমরা ইহাকে "গোলে বনফ্‌শা" বলে, কফনাশক, বহু টাকা সের বিক্রয় হয়।" শুনিয়া কলিকাতার দাদারা ডাল ভাঙ্গিয়া ফুলগুলি কৌটায় করিয়া আনিলেন, চা এর সঙ্গে ফুটাইবেন যাতে সর্দ্দি নাশ হয়। পরদিন আহারাদির পর শ্রীশ্রীবাবার নিকট সকলে বসিয়া আছি, এমন সময় একজন পাঞ্জাবী ঔষধ বিক্রয় জন্য প্রবেশ করিল। প্রথমেই নাম করিল "লোমনাশক চূর্ণ।" শ্রীশ্রীবাবা শুনিবামাত্র "কই দেখি ? কি দাম ? পরীক্ষা করিব" বলিয়া আট আনা দিয়া এক পুরিয়া লইয়া সামান্য জল দিয়া অল্প চূর্ণ পায়ের চুলের উপর লাগাইলেন, বিক্রেতাও দাঁড়াইয়া রহিল। সত্যই লোমনাশ হইল দেখিলেন। দেখিয়া বলিলেন, "ঠিক আছে।" তখন সে চলিয়া গেল। শ্রীবাবা পুরিয়াটি লইয়া বারাণ্ডায় আসিয়া লেন্স দ্বারা (Lens) ফোকাশ করিতেই উহা জল হইয়া গেল। সেই জল পুনরায় লাগান হইল, লোম নষ্ট হইয়া গেল না। দেখিয়া বলিলেন, "বাস্, আট আনা খরচে শেখা হইল।" ঘরে বসিয়া সাদা কাগজের উপর প্রস্তুত করিলেন। ঐ দিন শ্যামাগতি দাদা

সস্ত্রীক মোটরযোগে দর্শনের জন্য শ্রীশ্রীচরণে উপস্থিত হন। সঙ্গে একজন ঠিকাদার ছিল। আমি বাড়ী যাইবার প্রস্তাব করিলে, শ্যামাগতি দাদা তাঁহার স্ত্রী পুত্রকে লইয়া তাঁহার ভাগার বাসায় পঁহুছাইয়া দিয়া পরদিন বাড়ী ফিরিতে বলায় আমি সম্মত হইলাম। ঐ রাত্রি সেখানে থাকিয়া পরদিন বাড়ী ফিরিলাম। শ্রীশ্রী৺বাবার স্মৃতি আমাদের প্রত্যেকের প্রতি কর্ম্মেই বিজড়িত রহিয়াছে, যখন যাহা স্মরণ পথে আসিতেছে তাহাই জানাইতেছি। ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশের কল্পনা কখন ছিল না। শ্রীগোপীদাদাদের উদ্যমে এই কার্য্য হইতেছে বলিয়াই লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠাইতেছি। রোহিণী দাদা বর্ত্তমানে শ্রীগুরুধাম প্রাপ্ত। শ্যামাগতি দাদা ডাক্তার বর্ত্তমানে লোদনাতেই পেন্সন ভোগ করিতেছেন।

৪। এবারে বর্দ্ধমান আশ্রমে ৺শিবরাত্রি। আমার কাকার পরলোক গমনের পঞ্চম দিন। বড় মন দুঃখে যাইতেছে,—অশৌচ অবস্থা, পূজা করিতে ত পাইব না। তথাপি শ্রীশ্রীচরণ দর্শন তো হউক। এইজন্য সকালেই পঁহুছিলাম। প্রণাম মাত্রেই বাবা বলিলেন, "এই যে বেটা এসেছে, যাও জল খাওগে। আর যাঁরা আসবেন সকলকে ভাণ্ডার হইতে জলখাবার লইয়া দিবে। কেহ না পাইলে বা ত্রুটি হইলে তুমি দোষী হইবে।" আমি দ্বিরুক্তি না করিয়া সেই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া বাহিরেই থাকিলাম, কেহ আসিবামাত্র ভাণ্ডারে লইয়া গিয়া পূর্ণ হাজরা দাদা ও দিবাকর দাদার নিকট জলখাবারের বরাত দিয়া ও চাকরকে জল দিতে বলিয়া দিয়া কর্ত্তব্য করিলাম। কারণ মনে সঙ্কোচ রহিয়াছে আমার অশৌচাবস্থা। পরদিন রাত্রি সাড়ে নয়টায় চতুর্দ্দশী লাগিবে,

সন্ধ্যার পূর্ব্বে শ্রীবাবা উপরে উঠিয়া যাইবেন। সকলেই প্রণাম করিলেন, আমি সিঁড়ির কাছে গিয়া প্রণাম করিয়া প্রকাশ করিলাম, "আমার কাকা পাঁচ দিন পরলোক প্রাপ্ত, আমি পূজা করিতে পাইব কি ?" উত্তরে—"কেন পাইবে না, আমাদের পিতামাতার পরলোক প্রাপ্তি ভিন্ন অশৌচ নাই। নিশ্চয়ই পূজা করিতে পাইবে।" সঙ্গে সঙ্গে অনাথ চক্রবর্ত্তী দাদা (কুমারডুবির বড়বাবু) বলিলেন, "আমি ত বাবা পূজা করিতে পাব না, আমার এক কন্যা হয়েছে।" উত্তরে বাবা বলিলেন, "তোমার পূজা ক'রে কাজ নাই।"

৫। এবারেও বর্দ্ধমান আশ্রমে শ্রীশ্রী৺শিবরাত্রি—সকালেই শরৎ খাঁ দাদা (বর্ত্তমানে গুরুধাম প্রাপ্ত) আমাদের অনেককেই সকালে রাণীসায়র, শ্যামসায়র হইতে ফুল সংগ্রহের জন্য সঙ্গে লইয়া গেলেন। বিল্বপত্র ও ফুল আশ্রমে দিবার পর বীরেন দাদা আমার উপর ভার দিলেন, 'বৈকালে পুষ্পপাত্রে প্রত্যেক জাতীয় পুষ্প পৃথক্ করিয়া শ্রীশ্রী৺বাবার পূজার জন্য সাজাইয়া রাখিবে ও ভাল ভাল বিল্বপত্র রাখিবে।' বীরেন দাদার আদেশ মত পুষ্প পাত্রে সাজাইয়া দিলাম ; কিন্তু তুলসী পত্র দিই নাই, উহা চয়ন করা ছিল না এবং আমি জানিতাম না যে তুলসী দিতে হয়। শ্রীশ্রীবাবা নির্দ্দিষ্ট সময়ে পূজা শেষ করিয়া পূজনীয় শ্রীযুক্ত দুর্গাদাদাকে পূজা করিতে ও মেয়েদের করাইয়া দিতে আদেশ করিয়া নিজ আসনে আসিয়া বসিয়াই বলিলেন—"কোন্ বেটা গোঁড়া পুষ্পাদির যোগাড় দিয়াছিল ?" আমি বলিলাম—"কেন বাবা, কি ত্রুটি হইল ? আমিই দিয়াছিলাম।" "তুলসী দাও নাই কেন ?"

"আমি জানি না যে তুলসী দিতে হয়। তবে আমার অপরাধের জন্য কি করিব ?" "কি আর করিবে ? ভবিষ্যতে আর যেন ভুলিও না। আমি নিজেই সংগ্রহ করিয়াছি ও পাত্রে এখনও অনেক আছে দেখ।" গিয়া দেখিলাম কি সুন্দরভাবে বোঁটাসহ শ্বেত ও কৃষ্ণ উভয় রকম তুলসীই পাত্রে সাজান রহিয়াছে। শ্রীশ্রীবাবা ভিতরে ঢুকিয়াই দরজা বন্ধ করিয়াছিলেন। মনে ভাবিলাম ইচ্ছাশক্তি দ্বারা সংগ্রহ করিয়াছেন। আর কখনও ভুল করি নাই। শরৎ খাঁ দাদা (ব্রাহ্মণ) যতদিন ছিলেন, রাত্রিতে নানা হাসির গল্প বলিতেন, তরকারী কুটাও হইত, উপবাস লাগিত না, আনন্দে সময় কাটিত।

৬। শ্রীশ্রীবাবা কলিকাতায় কুণ্ডুর রোড বাড়ীতে। কোন কলিয়ারীর একটি বাবু শ্রীশ্রীবাবার নিকট দীক্ষার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত দ্রব্যাদি যোগাড় করিয়া শ্রীশ্রীবাবাকে প্রণাম করিলেন। বলিলেন, "বাবা, সব দ্রব্যাদি লইয়া আসিয়াছি, কাহার নিকট দিব ?" বাবা বলিলেন, "তোমার দীক্ষার অনুমতি হয় নাই।" "না বাবা, এই যে পত্র।" "হাঁগো, শ্রীশ্রীদাদা গুরুদেব স্বস্তি করেন নাই, পরে জানাইব। তবে তুমি আশ্রয় পাইবেই।" তিনিও মন-মরা হইয়া ফিরিয়া গেলেন। একটু পরেই এক ভদ্রলোক একটি পুত্র ও স্ত্রীসহ প্রণাম করিয়াই দীক্ষা প্রার্থনা করিলেন—নামধামাদি জিজ্ঞাসার পর বাবা বলিলেন, "যদি সব যোগাড়াদি করিয়া আনিতে পার কাল বিকালে উপস্থিত হইবে, তোমাকে দীক্ষা দিব। ননীর নিকট দ্রব্যাদির ফর্দ্দ লিখিয়া লও।" জিজ্ঞাসায় জানিলাম, ইনি শ্রীবাবার নাম বহুদিন শুনিয়াছেন, আজই প্রথম দর্শন ও প্রার্থনা। বুঝিলাম আমারও

কতকটা তাই, তবে আমি উপেন দাদা ও রাধিকা দাদা দ্বারা সাহায্য প্রাপ্ত। যাহা হউক, তিনি পরদিন ঠিক বিকালে সস্ত্রীক উপস্থিত হইলেন—দ্রব্যাদি সন্ধ্যায় বাবার আহ্নিকের ঘরে দেওয়া হইল ; ভোরে দীক্ষাও হইল উভয়ের (নামটি স্মরণ হইতেছে না, তবে ডাক্তার)। তাঁহারা কুমারী ভোজন করাইতে গেলেন। বাবা আসিয়াই "মুনীন্দ্র, এক দাগ ঔষধ দাও যাহাতে ডিস্‌পেপ্‌সিয়া ও সর্দ্দির উপকার হয় ; বেটীর প্রবল ডিস্‌পেপ্‌সিয়া।" ঔষধ দেওয়া হইল। একটু পরেই বলিলেন, "বাস্, এখন সুস্থ।" আমি সুস্থ ও শান্ত দেখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"বাবা, একজন কাল অনুমতি পেয়েছে ফিরিয়ে দিলেন, আর একে দীক্ষা দিয়েই ঔষধ খেতে হলো।" বাবা—"ওরে বেটা, ওর শীঘ্রই স্ত্রী বিয়োগ হবে—মনে করবে দীক্ষা লইয়া স্ত্রী বিয়োগ হইল। আর এ বেটা ডাক্তার। যক্ষ্মার পূর্ব্ব রূপ দেখা দিয়েছে—বৌমাটি খুব ভাল ও ডিস্‌পেপ্‌সিয়াগ্রস্ত। উভয়ে আগ্রহের সহিত কাজও করিবে, রোগমুক্ত হইয়া জগতের বহু উপকার করতে পারিবে, আর সেও স্ত্রী-বিয়োগে ব্যাকুল হইলে দীক্ষা লাভ করিবে এবং উন্নতি করিতে পারিবে।" আমার চক্ষে জল পড়িল, ভাবিলাম এ সব না দেখিতে পারিলে কি জগদ্‌গুরু বলা হয় ? ঠাকুর না চিনাইলে কে চিনিবে! এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা মনে পড়িল। কাশী আশ্রমে একজনের দীক্ষা হয়, তিনি প্রার্থনার সাত বৎসর পরে অনুমতি পান। তার পরেই বাবা হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন, "এক দাগ হাঁপানির ঔষধ দাও।" তৎক্ষণাৎ এক দাগ ঔষধ করিয়া দিলাম, পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে সুস্থ হইয়া বলিলেন, "বেটার ভীষণ

হাঁপানির ব্যারাম। আমি যেমন বলিলাম, "এত কষ্ট ত জানেন, তবে না দিলেই হতো।" উত্তরে বলিলেন, "সেটা ভুল হয়েছে, তোমাকে জিজ্ঞাসা না করা।" কি করিব, মুখ নামাইয়া রহিলাম। বৈষ্ণব কবির গান একটি মনে পড়িল—

গোঁসাই দিলেন মহামন্ত্র, তুই তাতেই ডুবে থাক্ দেখি,
গোঁসাই মন্ত্র দিলেন দেহ নিলেন, আবার নিতে বাকী কি?
ওরে আমার মন পাখী, জয় রাধা রাধাকৃষ্ণ বলে ডাক দেখি।

এখন মনে পড়িতেছে সেই দাদাটি নরহরি মজুমদার। তাঁর একটি ছেলেও শ্রীদাদার নিকট দীক্ষালাভ করিয়াছে জানি। আমার ছোট ছেলেটিও শ্রীশ্রীবাবার ইচ্ছানুসারে শ্রীদাদার প্রথম শিষ্য—বর্দ্ধমান আশ্রমে দীক্ষাপ্রাপ্ত। সুযোগ হইলে এ বিবরণও জানাইব।

৭। কাশী আশ্রমে গিয়াছি। বেড়াইবার জন্য যে রাস্তাটি করা হইয়াছিল সেখানে সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতেছি। ভাণ্ডার ঘরের সামনে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "বৌমার কি হয়? কি অসুখ?" বলিলাম, "কই, অসুখ তো দেখে আসি নাই।" বাবা—"নাগো, তা নয়, প্রত্যহ আহ্নিকের সময় কি একটা কষ্ট বোধ করে জান কি?" "হাঁ বাবা, কোমরটা ত বাতে বেঁকে গেছে, পদ্মাসন ও করতে পারে না। কোমরে বেদনা বোধ করে। পত্র লিখেছে নাকি?" "না, আমি ঔষধ দিব, লইয়া যাইবে।" বেড়ান শেষ হইলে উপরে বিশ্রামের পর আহ্নিকের ঘরে ঢুকিয়াই ডাকিলেন, "মুনীন্দ্র, এক দুয়ানীতে কত গ্রেন হয়?" বলিলাম, "সাড়ে বাইশ গ্রেন।" একটি শিশি বাহির করিয়া স্কেল বক্সটি (Scale Box) হাতে

দিয়া বলিলেন, "এক চুয়ানী ওজন কর, বৌমাকে দিবে।" ব্যবস্থা বলিয়া দিলেন। শিশির গায়ে লেখা "স্বুবর্ণ হীরকাদি ভস্ম, প্রতি আনা বার টাকা" লেবেল। বলিলাম, "টাকা আনি নাই, এখন টান চলেছে।" শ্রীবাবা বলিলেন, "টাকা দিতে হবে না।" "সে কি, বাবা ? জ্ঞানগঞ্জে ত টাকা দিতে হবে ?" বলিলেন, "আমিই দিব। বাবার থাকলে বেটায় নেয়, বেটার থাকলে বাবা নেন। তোমায় সে চিন্তা করিতে হইবে না।" ঔষধ ওজন করিয়া লইলাম ; সেবন করিয়া ফলও হইল, পরে চেষ্টা করিয়া মাত্র ছয় টাকা পাঠাইয়াছিলাম। মঙ্গলময় ঠাকুরের যে কি প্রকার লক্ষ্য ও দয়া, প্রতি বিপদে বুঝিতে পারিয়াছি। তবু মূঢ় মন বাগ মানে না। সেটি আমাদের দুর্ভাগ্য বলিব না। তা হলে আশ্রয় পাইতাম না। তবে পূর্ব্ব দুষ্কর্ম্মের ফল বলিতে বাধ্য। তখন এক আনি বার টাকা ছিল, এখন আঠারো টাকা বার আনা মূল্যে এক আনা পনের গ্রেন।

৮। আমি শ্রীশ্রীবাবার চরণপ্রান্তেই আছি। সকালে সাড়ে সাতটার সময় বাহিরে বিছানায় বসিয়াই বিছানার এক কোণ তুলিয়া বলিলেন, "মুনীন্দ্র, দেখ ত কত টাকা আছে। এই টাকা লইয়া মদনকে মনিঅর্ডার করিয়া দিয়া আইস।" এক্কা ভাড়াও তিন আনা পৃথক্ দিলেন। আমি—"কেন বাবা, কি হয়েছে ?" শ্রীবাবা— "ছেলেটা টাকার জন্য বড় ছট্‌ফট্ করিতেছে। সেও আমারই ছেলে।" আমি—"দেখে এলেন নাকি ?" "হাঁ, যাও, দিয়ে এসো।" নীচে নামছি, আর দেখি সুরজপ্রকাশ মুশরাণীর পিতা রামনগরের জজ। অনুমতি নিয়া তাঁহাকে

পৌঁছাইয়া দিয়া বলিলাম, "ইহাকে দিলে চলিবে ?" বাবা সম্মতি দিলেন এবং সেই চল্লিশ টাকা ও কমিশনের পয়সা বাবা তাঁহার হাতে দিলেন, আমি মনিঅর্ডার লিখিয়া কাগজটি তাঁহার হাতে দিলাম। শ্রীশ্রীবাবার দয়ার কথা আমি কি জানাইব ? প্রত্যেক দাদাই এ সব পেয়েছেন নানা প্রকারে। এই প্রসঙ্গে আমার রচিত "দীনহীন পাগলের পাগলামী" হইতে একটি গান দিলাম।—

রাগিনী—পরজ

কৃপা বিতরণে দেব নও তো কৃপণ,
সার বুঝেছি এখন।
কৃপাদানের কৌশল দেখি, অনুক্ষণ আনন্দে ভাসি,
তবু কেন বিপথেতে ছুটে মূঢ় মন।
মন আমার অতি মূঢ়, দয়া ক'রে কর দৃঢ়,
সদা লগ্ন থাকে যেন তব শ্রীচরণ।
যদি দিয়েছ আনন্দ আস্বাদ, আর ঘটায়ো না বিষাদ,
অনুক্ষণ হয় যেন চরণ-সুধা-পান ;
সুধা-পানে মত্ত হয়ে, তব গুণ গাহিয়ে,
জয়গুরু শ্রীগুরু ব'লে যায় হে জীবন।
পাগলের শেষ নিবেদন, দেখো করো না বঞ্চন।

৯। আমি শ্রীশ্রীবাবার নিকটেই আছি। শ্রীশ্রীবাবার অসুখ, ডাক্তারের ছড়াছড়ি, সবাই শিষ্য ও শিক্ষিত, কিন্তু অসুখ প্রায় এক ভাবেই ভোগ হইতেছে দেখিতেছি। চতুর চূড়ামণি ঠাকুরটির খেলা তখন বা তাহার পূর্ব্বেও কেহ বুঝি নাই।

শ্রীশ্রীবাবার এক শিষ্যা কলিকাতায় থাকেন, বর্দ্ধমানে শ্রীপতি দত্ত দাদাদেরই আত্মীয়া ও অবনী দত্ত দাদার স্ত্রী। তিনি এক দুপুরে আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিলেন, "বাবা, আমি একবার ডাক্তার শিবপদ ভট্টাচার্য্যকে দেখাতে ইচ্ছা করি, আমি টাকা দিব, অনুমতি করুন। আমাকে তিনি মৃত্যুর কবল থেকে বাঁচিয়েছেন।" বাবা —"বেশ তো, দেখাও। মেয়ে বাপকে দেখাবে, টাকাটা আমিই দিব।" তিনি বলিলেন, "না বাবা, আমিই দিব।" তাহাই হইল, ডাঃ শিবপদবাবু আসিলেন. সব পূর্ব্বাপর ইতিহাস শুনিলেন, ডাঃ নীলরতন সরকার ও ডাঃ ডেনাম হোয়াইটের পূর্ব্বকালের সব ব্যবস্থা-পত্র, প্রস্রাব পরীক্ষাদির কাগজ পত্র বাহির করিয়া দেখাইলাম। তিনিও বেশ বিচার করিয়া ব্যবস্থা-পত্র লিখিয়া দিলেন। আশ্চর্য্য ব্যাপার! প্রথম দাগ সেবনের পর হইতেই যেন বাবাকে প্রফুল্ল দেখা যাইতে লাগিল। পরদিন তিনি আবার দেখিয়া গেলেন। সকলেই আনন্দিত—কে জানিত এর ভিতর রহস্য রহিয়াছে। এখন বুঝিয়াছি বলিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব কথা কিছু না লিখিয়া পারি না। অমৃত বাজার পত্রিকার সংস্পৃষ্ট সত্যগোপাল দত্ত ও পরমানন্দ দত্ত উভয় গুরুভ্রাতা প্রত্যহ বর্দ্ধমান আশ্রমে এবং শ্রীশ্রীবাবা যেখানে থাকিতেন (কাশী ও কলিকাতা) সব স্থানে কাগজ দিতেন। তখন পাকুর মামলা কাগজে বাহির হইতেছে। যোগেশ দাদা ও প্রকাশ দাদা কাগজের মামলা অংশের উপর মন্তব্য প্রকাশ করিতেন—যেন শিবপদ ডাক্তারকে জেলে দিলেন, আর দেরী নাই, এইরূপ ভাব। প্রথম দুই একদিন শ্রীবাবা কোন মন্তব্যই করেন নাই। শেষে একদিন বলিলেন,

"কিছুই হবে না, তোমরা ত জেলে দিবার জন্য ব্যস্ত।" ঐ দিন হইতেই মন্তব্য করা বন্ধ হইল। কাগজ পড়িতেন মাত্র।

কে জানে শিবপদ ডাক্তার শ্রীশ্রীবাবার চরণে আশ্রয় পাবেন? ডাঃ শিবপদ বাবু বোধ হয় একদিনই ফি লইয়াছিলেন। চারি পাঁচ দিন আসিয়াছিলেন, টাকা দিতে গেলেও নেন নাই। এর পরই আমরা কাশী যাওয়ার পূর্ব্বে একদিন পিতা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ (তিনি নাকি জষ্টিশ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের গুরুদেব) ও পুত্র শিবপদ সাড়ে এগারটায় বাবার নিকট উপস্থিত। একটি চারি চরণের সংস্কৃত শ্লোক চরণে দিয়া উভয়ে প্রণাম করিলেন। শ্রীবাবা স্মৃতিতীর্থ মহাশয়কে প্রতি নমস্কার করিলেন। স্মৃতিতীর্থ মহাশয় এ কথা, সে কথা ও আরোগ্যের কথার পর উপবীত একবারে শ্রীবাবার হাতে জড়াইয়া বলিলেন, "আমার শিবপদকে আপনার চরণে দিলাম। 'বলুন নিলাম'।" শ্রীবাবার উত্তর, "হাঁ হাঁ, নিয়েছি, বহুদিন পূর্ব্বেই নিয়েছি।" পণ্ডিত মহাশয় পৈতা ছাড়াইয়া লইয়া খুব আনন্দ করিলেন, নিজে কি কি বই লিখিয়াছেন সব বলিলেন। শ্রীবাবার কাশী আসা হইল। তের চৌদ্দ দিন পরে একদিন বলিলেন, "বেটা বেশ চিকিৎসক। কিছু ত নেয় নাই, তাকে কিছু দেওয়া দরকার।" আমি বলিলাম, "হাঁ বাবা, প্রেসক্রিপ্সনের বাহাদুরী বটে, দ্বিতীয় বার কোন পরিবর্ত্তন করিতে হইল না। আর শুনেছি জীবনে যে তিন চার লাখ টাকা করেছিলেন সব ফরসা। আর এই মামলার পর ডাক একেবারে নাই, ট্রপিকালের চাকরীটিও নাই।" তিন চারি দিন পর মনে হইল শ্রীবাবা এবার টাকা ঠেলিয়া ঘরে ঢুকাইয়া

দিবেন। এ কারণ ডাঃ শিবপদ বাবুকে পত্র দিলাম—লিখিলাম কেমন ডাক চলিতেছে জানিতে ইচ্ছা।

ইহার দুই তিন দিন পর শিবু বাবুর দীক্ষা প্রার্থনার উত্তরে বাবাও দিন করিয়া দিলেন। শিব বাবু যখন আসিলেন প্রথমেই নীচে আমার সঙ্গে দেখা। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেমন চলছে আপনার ?" উত্তরে—"আপনার পত্র পেয়েছি, আসব বলে উত্তর দিই নাই, চৌদ্দ পনের দিন খুব চলছে। কেন বলুন ত ?" আমি উত্তর দিলাম, "সেদিন বাবা বললেন 'বেটা ত কিছু নেয় নাই, তাকে ত দেওয়া দরকার।' তাই আপনাকে লিখেছিলাম। শুনে আনন্দ হলো। আবার দাদাও হবেন আর কি ?"

নির্দ্দিষ্ট দিনে দীক্ষা হইল, তাঁহারা কলিকাতায় ফিরিয়া গেলেন, আমরাও গ্রীষ্মকালে কলিকাতায়। এবার বাবার অসুখ বেশী, কিন্তু নিয়মিত আহ্নিকাদিও বন্ধ নাই। শিবপদ দাদাও পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, রোজ সাড়ে এগারটায় শ্রীবাবাকে দেখিয়া যান, সাময়িক ব্যবস্থাও করেন। একদিন প্রেসক্রিপসন করিলেন, তাতে একষ্ট্রাকট অর্জ্জুন লিকুইড দিলেন। প্রথমে দেখালেন ডাঃ কৃষ্ণধন সিংহ দাদাকে, পরে ডাঃ প্রফুল্ল দাদাকে। আমার গ্রহ ফের, প্রফুল্ল দাদার হাতে প্রেসক্রিপসন দেখিয়াই বলিয়া ফেলিলাম, "এতে দাস্ত বন্ধ হয়ে যাবে।" যেমন বলা অমনি বাবা বলিলেন—"বেটা গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল।" ডাঃ শিবপদ এই কথা শুনিয়াই মাঝের সিঁড়ি দিয়া নীচে পলায়ন। আমি ভয়ে আর উঠিতে পারিলাম না। একবারে আহারাদির পর নিকটে গেলাম। শ্রীবাবা আর কোন কথা বলেন নাই, তবে

শুনিলাম কৃষ্ণধন দাদা ও শিবপদ দাদা উভয়েই আমাকে একটু ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছেন ও রাগ করিয়াছেন, কিন্তু কি করি ! আমার স্বার্থ শ্রীবাবার সুস্থতা। শিববাবুও জানেন না যে বাবার কি সূক্ষ্ম অনুভব। বলিয়া ফেলিয়াছি, আর ত ফিরে না। দেখা যাক, ফল কি হয়। ভয়ে ভয়ে রাত্রি কাটাইলাম। দেখিলাম সকালে সাড়ে নয়টা দশটাতেও শ্রীশ্রীবাবার দাস্তর জন্য কোন তলব নাই, একটু অস্বস্তিও বোধ করিতেছেন। আমি কিন্তু কোন কথা বলি নাই। ঠিক সাড়ে এগারটায় ডাঃ শিবপদ দাদা আসিলেন। প্রণাম করিয়াই—"বাবা, কেমন আছেন ?" শ্রীবাবা, "ভাল ত আছিরে বাপু, কিন্তু দাস্ত হয় নাই। একটু অস্বস্তি হচ্ছে," বলেই আমাকে কার্য্যান্তরে নীচে পাঠাইলেন। আমিও বাঁচিলাম। এখানে সেই ডাক্তারও আছেন, শিবু দাদার নিকট শুনিলাম। শিবপদ ডাঃ দাদা (আমার ভাগ্য ভাল) বলিলেন, "কাল ঐ কবিরাজটি যে বলেছিলেন তখন একটু মনে মনে রাগও হয়েছিল।" শ্রীবাবা "ওটি কবিরাজ নয়—আমার পুরাতন শিষ্য, ক্যাম্বেলে পড়েছে, বহুদিন চিকিৎসা করছে, দেশে বেশ খ্যাতিও আছে, সেই সাবেক পুরাতন পাতা উল্টাইয়া গৃহস্থের উপকার করে, আর পূর্ব্ব পুরুষ সকলে কবিরাজ। তোমাদের কলিকাতার মত এই যে একবার হজ সাহেবকে কি ব্রাউনকে ডাকলে ভাল হয়, তোমাদের দায়িত্ব শেষ। উহাদের তা নয়, বাঁচলে যশ— শেষ হলে আবার শ্মশান যাত্রার ব্যবস্থা পর্য্যন্ত করতে হয়। কাল বলেছিল, আমার ধমকে পালিয়ে গেল। বিজ্ঞানের ক্রিয়া ও জানে না, তবে ঔষধের ফলাফল বেশ লক্ষ্য করতে জানে।" এই

সব কথা শিবু দাদা নীচে আমাকে বললেন এবং বললেন, "উপরে যাও, ডাকছেন।" শুনেই উপরে গেলাম। খেলোয়ার ঠাকুরের খেলা। যাওয়া মাত্র ডাঃ শিবপদ দাদা বলিলেন, "কবিরাজ দাদা কেন বলেছিলেন দাস্ত বন্ধ হয়ে যাবে?" আমি বলিলাম, "ঐ অর্জ্জুনে ট্যানিন আছে তার জন্য। ইতিপূর্ব্বে এক দাগ দিয়াছিলাম, ডাঃ শোভারাম দাদা বলিয়াছিলেন বাবাকে অর্জ্জুন দিলেই সোডা না দিলে দাস্ত বন্ধ হইয়া যাইবে।" তখনই আমি বুঝিলাম, "সত্যই ত, বাবার সবই সূক্ষ্ম, কেন না নীচে কেহ আফিং খাবার জন্য হাতে লইলে বাসে গন্ধ অনুভব করিতেন। একবার হঠাৎ দুই তিনবার পাতলা দাস্ত (জলের মত), আমি Pulv Dovers Co দিয়া হঠাৎ বিপদ, পেট বেজায় ফেঁপেছিল।" এই সব শুনে prescriptionটি হাতে দিলেন, "আজ কি বলবেন?" আমি লজ্জিত হইয়া বলিলাম, "আজ ভালই হইবে, দাস্তও হইবে।" আমি বুঝিলাম এ সব বাবারই কৌশল, কালকার ঘৃণা ও রাগ সুদসহ আদায় দিয়া আমাকে শ্রীচরণাশ্রিত বলিয়া ডাঃ শিবপদ দাদাকে বুঝাইয়া দিলেন, আমিও মনে মনে শ্রীশ্রীবাবাকে প্রণাম করিলাম। তবুও বাবা ঔষধ সেবনের সময় বলিলেন, "কিগো, কি বুঝছ, খাব তো? কাল বলেছিলে, কিন্তু ধমকাইয়া দিয়াছিলাম।" উত্তরে আমি, "না বাবা খান, আজ দাস্ত হইবেই।" বলিয়া প্রণাম করিয়া কাঁদিয়া বলিলাম, "বাবা, অপরাধ নিবেন না, আমি বলে ফেলেছিলাম, ঐটি আমার দোষ।" বাবা বলিলেন, "বাক্য সংযত কর, সামান্য ঔষধে বড় ফল হয়, তুমি সেই সামান্য ঔষধটি প্রকাশ ক'রে বলে দাও, বিশ্বাসও হয় না তাদের।

তুমি যদি গোপন রেখে ঔষধটি নিজে দিয়ে সাবধান করে দাও, ফলও পাবে, বিশ্বাসও বাড়বে।" এবারে শ্রীবাবার অসুখ বাড়িয়াই চলিয়াছে। রোগ-ব্যাধির কথা যেন কেহ বাবার কাছে না বলে, এইরূপ সাবধানতা বেশ রক্ষা হইতেছে। কিন্তু তা হইলে কি হইবে? শ্রীবাবার ইচ্ছা কে রোধ করিবে? মেয়েছেলেকে তো আসিতেই দেওয়া হয় না। এ সত্ত্বেও নাম-মনে-পড়ছে-না কে এক গুরুভাই আসিয়া প্রণাম করিলে পরে এ কথা সে কথার পর এক দাদার কথা বাবাই নিজে জিজ্ঞাসা করিলেন আর দাদাটি বলিয়া দিলেন, "তার ভীষণ অর্শে রক্তপাত, বাঁচে কিনা সন্দেহ।" অমনি বাবা বলিলেন, "কোন চিন্তা নাই, সে ভাল হয়ে যাবে।"

পরদিনই শ্রীশ্রীবাবার অর্শ হইল, রক্তপাত হইল। প্রফুল্ল দাদা ডাক্তার শুনিয়াই Ung gallacum opio এক আউন্স প্রেসক্রিপ্সন করিয়া নিজে টাকা দিয়া আনাইয়া বাবাকে দিলেন এবং বলিলেন যে দুই একবার লাগাইলেই ভাল হইয়া যাইবে, রক্তপাতও বন্ধ হইবে। শ্রীশ্রীবাবাও আমাকে আদেশ করিলেন, "তুমিই লাগাইয়া দিবে।" সেদিন এবং পরদিনও ঔষধ লাগান হইল না। তৃতীয় দিনে ডাঃ শোভারাম এসেছিলেন। ঐ সব কথা হইতেছে—"মুনীন্দ্র কেন ঔষধ লাগাইয়া দিতেছে না—ঘৃণা? তাই বা কি করিয়া বলিব? সেদিন আমার কাপড় নিজে পরিষ্কার করিয়া পরে সাবান দিয়াছে।" কোন কোন দাদা রাগিয়া আছেন—কিছু কিছু বলিতেছেন। আমি নীচে ছিলাম, শিবুদাদা ডাকিয়া দিলেন। আমি কাছে যাইতেই কথার উপর কথা জিজ্ঞাসা। আমি বলিলাম, "ঐ মলমে আফিং আছে। আমি জানিয়াই দিই

নাই—আর রক্তপাত ত হয় নাই, আমি প্রত্যহ দেখিতেছি।” “দেখ তো শোভারাম, বেটা কি বলছে ?” প্রেসক্রিপ্সন দেখিয়াই শোভারাম দাদা বলিলেন, “এ কোন্ দিয়া ? ইসমে opium হ্যায়, বাবাকো অনিষ্ট হোগা।” আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম— “দেখুন ত দাদা।” আমি ত খালাস পাইলাম। এই সময় ডাঃ শিবপদ দাদা ও Dr. J. C. Gupta, Heart Specialist আসিলেন, তাঁহারা সব শুনিয়া Pulv anaesthesm 5 gr. & Vaseline zii ব্যবস্থা করিলেন। ঔষধ আনান হইল। আমি মাত্র দুইবার লাগাইয়া দিলাম। আর কোন ব্যথা ছিল না। ঐ দিনের পর Dr. J. C. Gupta হৃদ্‌যন্ত্রের ফটো তুলিবার যন্ত্র আনিয়া বাবার হৃদ্‌যন্ত্রের ফটো একবার লইলেন। দ্বিতীয় বার লইতে চাহিলেন, বাবা রাজী হইলেন না। সকলের অনুরোধে “আচ্ছা” বলিয়া লইতে দিলেন বটে, কিন্তু হঠাৎ যন্ত্রটি এক শব্দ করিয়া বন্ধ হইয়া গেল, কোনমতে ঠিক হইল না।

এই সময় অসুখে প্রস্রাব কম হইতে লাগিল। দেখা কাহাকেও করিতে দেওয়া হইত না। প্রবল গ্রীষ্ম, শার্শি খড়খড়ি বন্ধ, পাখা চলিতেছে, আমরা ঘর হইতে বাহিরে আসি মধ্যের সিঁড়ি দিয়া। বেলা একটা দেড়টা। বলিয়া উঠিলেন, “সামনের দরজাটা খোলো, মুনীন্দ্র।” আমি দরজা খুলিয়াই দেখি একটি দিদি ঐ দারুণ রৌদ্রে দাঁড়াইয়া আছেন। দেখিয়াই দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম। অমনি বলিলেন, “কে ঐ মা’টি, দেখতো :” আমি জোর করিয়া বলিলাম, “না, ও দেখতে দিব না।” শ্রীবাবা তখন ঠাণ্ডা হইয়া বলিলেন, “ডাক ডাক, ও সুরেশের স্ত্রী নয়

তো ?" কি করি, কাছে গিয়ে বলিলাম, "আসুন ! কিন্তু রোগটোগের কথা বলবেন না।" আসিলেন, প্রণাম করিলেন। শ্রীবাবা, "সুরেশ কেমন ?" তিনি চুপ। পুনঃ প্রশ্ন, "সুরেশ কেমন ?' দিদি চুপ। তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করায় কাঁদিয়া উঠিলেন, "ডাক্তার বলিয়াছেন আজ পার হয় কিনা।" শ্রীবাবা, "আমি বেঁচে আছি, কোন চিন্তা নাই। যাও, আমি বলছি, সে ভাল হয়ে যাবে।" হলোও তাই। সুরেশ দাদা সারিয়া উঠিলেন, শ্রীশ্রীবাবার হার্ট খারাপের দিকে গেল। সুরেশচন্দ্র সিংহ দাদা আলীপুর সেসন জজ ছিলেন। পূর্ব্বে বাবাকে তাঁর হার্ট এর অসুখের কথা জানান হয়, তাতেই বাবার হার্ট একটু খারাপ হয়। ডাঃ নীলরতন সরকার ঐ ঘটনার দুই চার দিন পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, "His heart is as strong as of a young man of thirty or forty." সেই হার্ট এবারে compensate করতে না পারায় এই অবস্থা। আমাদের মত অভাগাদিগকে নাই বা বাঁচাতেন! কেবল আমাদেরই জন্য যত কষ্টভোগ করিয়াছেন। তিনি বলিতেন, "আমাকে সাক্ষাদ্‌ভাবে কোন প্রকারে না জানাইয়াও নিজ ঘরে আহ্নিকের পরে মনে মনে জানাইলেই শ্রীগুরুশক্তি তোমাদিগকে আশাতিরিক্ত ফল দিবেন।" কিন্তু মূঢ় আমরা, জানাইয়াই তাঁহাকে তিল তিল করিয়া দগ্ধ করিয়াছি। করুণাময় কিন্তু কোন দিনই কৃপাদানে কৃপণতা করেন নাই।

এই প্রসঙ্গে গঙ্গাধর দাদার সেবার কৃতিত্ব সম্বন্ধে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। গঙ্গাধর দাদা পঁয়তাল্লিশ বা পঞ্চাশ টাকা বেতনে চাকরী করিতেন। সকালে ও বিকালে দুই তিনটি

টিউশন করিতেন। ঠিক নয়টায় শ্রীশ্রীবাবাকে প্রণাম করিয়া পান লইয়া চাকরীতে যাইতেন। বিকালে শ্রীশ্রীবাবা বেড়াইতে যাইবার পূর্ব্বেই আসিয়া প্রণাম করিয়া আমাদের কাহাকেও কাহাকেও বাড়ী লইয়া গিয়া মুড়ী, ঘুগনী ও চা খাওয়াইতেন এবং আবার টিউশনি করিতে যাইতেন। সন্ধ্যায় প্রণাম করিয়া আহ্নিক ভোজন সারিয়া ঠিক নয়টা রাত্রিতে হাজীর হইয়া অঙ্গুলিযোগে শ্রীবাবার চরণ ও গাত্র সেবায় লাগিতেন। তাঁহার মাথায় এমন-ভাবে হাত বুলাইতেন যে হাত দিতে না দিতে তাঁহার ঘুম আসিত। আমি সে ভাবে চেষ্টা করিয়াও পারি নাই। শুধু তাই নয়, কোন কোন দিন এমন হইত, রাত্রে শ্রীবাবা কিছুই না খেয়ে আছেন, রাত্রি বারটা একটার সময় গঙ্গাধর দাদা জিদ ধরিলেন, "বাবা, কিছু খান।" বাবা শেষে বলিলেন, "খেতে পারি যদি কুমারীর প্রসাদ পাই।" অমনি গঙ্গাধর দাদা উঠিলেন, "আমি কুমারী খাওয়াইয়া প্রসাদ আনছি।" শ্রীবাবা তাঁকে দুই তিনটি টাকা দিলেন, তার মধ্যে চারিটি সিকি। মিষ্টির দোকানদারকে উঠাইয়া মিষ্টি লইয়া গৃহস্থ ঘরে গিয়া চারিটি কুমারী পূরণ করিয়া, কুমারী মা-দিগকে নিজে মুখে চোখে জল দিয়া ঘুম ভাঙ্গাইয়া ভোজন করাইয়া দক্ষিণা দিয়া তাঁহাদেরই পাত্রে প্রসাদ আনিয়া শ্রীবাবার হাতে দিলে শ্রীবাবা তাহা সেবা দিতেন এবং আমাদের জাগ্রত সকলকে প্রসাদ দিতেন। এমন একদিন নয়, মাঝে মাঝে শ্রীবাবা শিশুর মত না খাইলেই রাত্রে ঐ ঘটনা ঘটিত! গঙ্গাধর দাদাকে শ্রীবাবা অহৈতুকী কৃপা করিয়া টাকাদিও দিতেন। লক্ষ্য করিয়াছি শ্রীশ্রীবাবাকে প্রায়ই তিনি "মা তুমি" বলিতেন, কদাচিৎ "বাবা

আপনি" বলিতেন। রাত্রি আড়াইটা পর্য্যন্ত জাগিয়া সেবারত থাকিয়া এক দেড় ঘণ্টা ঘুমের পরই প্রণাম করিয়া চারিটা সাড়ে চারিটায় বাড়ী চলিয়া যাইতেন এবং নিজের ক্রিয়াদি সারিয়া পূর্ব্ববৎ কাজ করিতেন।

এবার যখন শ্রীশ্রীবাবা কাশী হইতে আসেন, তার কিছুদিন পূর্ব্বে "ওমানন্দ ব্রহ্মচারী" নামে এক ব্যক্তি তাঁহার গুরুদেব স্বামী সোমতীর্থদেবের (নাম মনে পড়িতেছে না) পত্র লইয়া এক দিন আসেন ও প্রণাম করিয়া শ্রীশ্রীবাবাকে দেন। তাহার মর্ম্ম, "আমি আমার শিষ্য ওমানন্দকে আমার শক্তি মত প্রস্তুত করিয়া আপনার শ্রীচরণে দিতেছি, আমার জ্ঞানে আপনি ব্যতীত কাহাকেও উপযুক্ত দেখি না, কৃপা করিয়া ইহাকে গ্রহণ করুন এবং ইহার দীক্ষাদি যথাকর্ত্তব্য বিধান করুন, এই প্রার্থনা।" ওমানন্দ পূর্ব্বে গৃহী অবস্থায় কোন স্কুলের মাষ্টার ছিলেন, কিছু জমীজমাও ছিল। পরে নিজের ভাগিনেয়কে সব দিয়া উক্ত স্বামীজীর নিকট যান। শ্রীশ্রীবাবা কিছু উপদেশ দেওয়ার পর তাঁহাকে নিজের সঙ্গে কলিকাতায় লইয়া যান। আশ্রমে তাঁহার সেবার জন্য প্রত্যহ এক ছটাক মুগ ডাল, এক ছটাক ঘৃত এবং এক পোয়া আলু ও আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি দেওয়া হইত। তিনি এক পাকে নিজ হস্তেই তৈয়ার করিতেন। তিনি কয়েকটি আসনে অভ্যস্ত ছিলেন, রাত্রে ঘুমাইতেন না। একদিন শ্রীবাবা তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখাও তুমি কি আসনে অভ্যস্ত।" দেখিয়া তিনি ঐ অসুখ অবস্থাতেই তাঁহাকে দেখাইলেন, নাভির মধ্য হইতে একটি সার্চ্চ লাইটের জ্যোতি বাহির হইতেছে। সেই

রাত্রে ডাঃ শিবপদ দাদাও আসিয়াছিলেন, তিনি এ কথা সে কথার পর নাভিতে হাত ঢুকাইয়া দিলেন, তাঁর কব্জী পর্য্যন্ত ঢুকিয়া গেল! বহু কথা আছে। কোনটি বলি আর কোনটি না বলি। শ্রীশ্রীবাবার স্মৃতি প্রতি কাজেই জড়িত রহিয়াছে, আবার যদি তাঁহার কৃপা হয় পরে জানাইব।

১০। এবার শ্রীশ্রীদুর্গাদাদার স্মরণে কিছু লিখি। প্রথম যে বৎসর অণ্ডালে আসেন, বড়দিনের সময় 'আসিব' বলিয়া আর আসেন নাই, পরে শেষ বৈশাখে এলেন। গো-গাড়ী লইয়া ষ্টেশনে পঁহুছিতে পাঁচ ছয় মিনিট দেরী হইয়াছিল। দেখি একজন কাবুলী শ্রীশ্রীদাদার সুটকেশ লইয়া জল বরফের দোকানে বসাইয়াছে। প্রণাম করিতেই হাসিয়া উঠিলেন, "না এলে পাল্টা ট্রেণে ফিরে যাইতাম।" গো-গাড়ীতে উঠিলেন না, "চল হেঁটেই যাব।" জিনিসপত্রাদি, লেমনেড, ডাব, বরফ গাড়ীতে দিলাম, দুজনে হেঁটেই গেলাম। বাড়ী পঁহুছিয়া চা সেবার পর বেড়াইতে বাহির হইলাম; গ্রামের যাঁহারা শ্রীগুরুদেবকে জানিতেন তাঁহাদের অনেকেই আসিয়া প্রণাম করিলেন। বসিয়া চা বৈঠক ও গল্প চলিবার ব্যবস্থা করিয়া আহ্নিক সমাধা করিয়া লইলাম। শ্রীদাদা নিয়মিত ভাবে আহ্নিক করিতেন না। খেয়াল মত কোনদিন দুই তিন চার ঘণ্টাও আহ্নিকে বসিতেন। লুচি মিষ্টি রাত্রেও ভোজনে বিরক্ত ছিলেন, কিন্তু ভোগে সবই ব্যবস্থা করা হইত।

প্রথম রাত্রির পর বলিলেন, "মনীদাদা, আজ চার পাঁচ দিন ধরে একটি মাথা-কাটা শিব রাত্রে এসে বলছেন 'আমার পূজা কর,

জায়গা ঠিক মনেও হচ্ছে, কেমন ভাঙ্গা মন্দির।" আমি অবশ্য ভাবিলাম খেয়ালী দাদা কি বলিতেছেন কি বুঝিব। দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় শ্রীজগদানন্দ ও পূর্ণানন্দ গোস্বামীর গাড়ী তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য আসিল। রাত্রে থাকিয়া চারিটায় ভোরে রওনা হইলাম, আমিও সঙ্গে গেলাম, কারণ আমিও ইছাপুরেই থাকি। পাটসাহড়া গ্রামখানি পার হইয়া যাইতে যাইতে বলিলেন, "ঐ দেখা যায় উঁচু জায়গা, অশ্বত্থ গাছটি ঠিক ঐ রকম মনে হচ্ছে।" আমি বলিলাম, "ঐটি ভীমনাথেশ্বর বা ভীমনাথ বা ভীমেশ্বর শিবের ভাঙ্গা মন্দির।" অমনি গাড়ী হইতে নামিয়া, "চল দেখবো।" হেঁটে হেঁটে উভয়ে গেলাম, গাড়ী গাড়ীর রাস্তায় গেল। পঁহুছিয়া দেখিয়াই বলিলেন, "এইটিই ত ঐ শিব, কাল পূজা করব।" আমি ইছাপুরের শ্রীশ্রী৺বাবার শিষ্যদের ডাকিয়া পাঠাইলাম। তাঁহারাও জানিতেন এবং সর্পী যাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, রাস্তাতেই সকলে প্রণাম করিলেন। বলিলেন, "ভীমেশ্বর পূজা করিব, তোমরা সব যোগাড় লইয়া চারটে সাড়ে চারটায় উপস্থিত হইতে পারিবে কিনা?" হরিবোল, গোষ্ঠ, বাঘাম্বর সকলেই ভার লইল, ক্ষিতীনের ভগিনী চায়ের এবং সুরেশ কিছু জলযোগের অনুমতি লইল। আমি সর্পীই গেলাম।

রাত্রি তিনটার সময় কয়েকটি গো-গাড়ীসহ ইছাপুর ভীমেশ্বরের ডাঙ্গায় উপস্থিত হইয়া দেখি সকলে পূজা-সম্ভার লইয়া উপস্থিত। অতি নিকট পুকুরে স্নান সারিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখিয়া লইতেছেন। সব ঠিক, কিন্তু আতপ তণ্ডুল নাই। একজন দৌড়িয়া আনিতে গেল ও প্রায় দশ মিনিট মধ্যে ফিরিল।

দাদা শ্রীশ্রীমহাদেবের পূজা করিয়া বাহির হইলেন আর শ্রীশ্রীবাবার অঙ্গ-সৌরভ ভর ভর করিয়া ছড়াইয়া পড়িল। বহু লোকের সমাগম হইল। জলযোগের ব্যবস্থাও হইল। যা আনা ছিল সমাগত সকলকে দিয়া নিজে প্রসাদ করিয়া আমাদিগকে দিলেন। চা সেবাও হইল, সকলেই শ্রীশ্রী৺বাবার অঙ্গ-সৌরভ পাইয়া, "পিতার পুত্র, কেন হবে না" বলিয়া শ্রীগুরু-দর্শনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিলেন। খুব আনন্দ হইল। শ্রীদাদা কিন্তু বলিলেন, "মনীদা, আজ মেজাজটা একটু বিগরে ছিল। কাল আবার পূজা করিব সর্পী হইতে সব দ্রব্য পুষ্পাদি আনিয়া।" বলিলেন, "এটি সিদ্ধাসন, আসনটি দেওয়ালে পরিয়া গিয়াছে।" আমি "হাঁ দাদা, তাহাই হউক।" এই মহাদেবের প্রবাদ আছে—এখানে বলে যে ইহা বক্রেশ্বরের মত পীঠস্থান হইত, তবে কাক ডাকায় শেষ হয় নাই। পাথরের মন্দির পূর্ব্বে ছিল না, একরাত্রেই মন্দির প্রস্তুত। সামনে দুইটি পাথর, তাহাদিগের একটি বাঘ ও একটি বলদ এইরূপ। স্থানটি বেশ নির্জ্জন। দুইটি গ্রামের মধ্যে ছোট টিলার উপর অশ্বত্থ গাছে পাথরের মন্দির ঢাকা থাকিত। এখন গাছটি পড়িয়া গিয়াছে। পাটসাহরার সীমানায় বর্দ্ধমানরাজের নিত্যপূজার জমি একজন ব্রাহ্মণকে দেওয়া আছে। নিকটেই আম বাগান, লাগাও বড় পুষ্করিণী, সামনে ও পশ্চিমে ডাঙ্গা। টিলায় দুই চারিটি বন্য গাছ, তার তলায় দুই একজন সন্ন্যাসী কুঁড়ে বেঁধেছিলেন। পরদিনও পূজা করিবেন। আট দশ দিন থাকিবেন। প্রত্যেক ঘরেই মহোৎসব, সব গুরুভাইরা আসেন, ভোজনানন্দ হয়, আবার মাঝে মাঝে নিজ খেয়ালে এমন দুই এক

কথা বলেন যে সকলে অবাক্ হইয়া যায়। বহু পূর্ব্বে একবার এখানে আসিয়াছিলেন। শ্রীজগদানন্দ গোস্বামী ও শ্রীদক্ষিণা প্রসাদ রায় চৌধুরীর বাড়ীতেই রাত্রিতে থাকিতেন। আমি সকালে ইছাপুর গিয়া ঔষধাদি দিয়া ঠিক প্রসাদ পাবার কালীন উপস্থিত হইতাম। পর বৎসর হইতে শ্রীশ্রী৺শিবরাত্রির সময় পাঠসাহড়া গ্রামের লোকেরা পূজা, উৎসব ও মেলা ধূমধামের সহিত করিতেছেন। মানসিকাদিতে ফলও পাইতেছেন, এখনও সমানভাবে চলিতেছে। পূর্ব্বে কিন্তু কেহ লক্ষ্যই করিত না।

শ্রীগুরু-প্রসঙ্গ

শ্রীক্ষেত্রগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীশ্রীগুরুদেব আমাদের উপকারার্থে প্রসঙ্গ ক্রমে যে সকল অমূল্য উপদেশ দান করিতেন তন্মধ্যে যতটা আমার স্মৃতিপটে এখনও জাগ্রত আছে, তাহাই কিঞ্চিৎ বিবৃত করিতেছি। বলা বাহুল্য, ইহাতে আমার কোনও মৌলিকতা নাই; এই বিবরণে যে সকল ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটিবে তাহার দায়িত্ব অবশ্যই আমার। আমি শ্রীশ্রীবাবার উপদেশের ধারা বা ক্রম অনুসরণ করিতে সমর্থ নহি; আমি নিজের মতি ও বুদ্ধি প্রসূত ধারায়ই সকল কথা বলিয়া যাইতেছি, ইহা সহৃদয় পাঠককে মনে রাখিতে আমার অনুরোধ রহিল।

শ্রীশ্রীবাবা কথাচ্ছলে এমন সরল ও সরস ভাবে তাঁহার উপদেশ সকল ব্যক্ত করিতেন যে উহা তৎক্ষণাৎ আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইত। তিনি ছিলেন অন্তর্য্যামী মহাপুরুষ; কাহারও দোষ ত্রুটি তাঁহার দিব্যদৃষ্টি এড়াইয়া যাইবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু তিনি সভা মধ্যে কাহারও প্রতি ইঙ্গিত না করিয়া সাধারণ ভাবে দোষ গুণের প্রসঙ্গ তুলিতেন। উপস্থিত মণ্ডলীতে যিনি ঐরূপ কোনও দোষে দোষী থাকিতেন, তিনি উপলব্ধি করিতেন যে, তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া উপদেশ দেওয়া হইতেছে। অন্যে তাহা বুঝিতে পারিত না।

আমাদের এই দেশ সম্বন্ধে বাবা বলিতেন, ভারতভূমি মহাপুণ্যভূমি, এবং এই হিসাবে ইহা অন্যান্য দেশ হইতে শ্রেষ্ঠ। অতি প্রাচীন কাল হইতে বহু যোগী, ঋষি, সাধু সন্তগণ আবির্ভূত হইয়া এই দেশকে আধ্যাত্মিক গৌরবে মণ্ডিত করিয়া দিয়াছেন। যাহারা এ দেশে জন্মগ্রহণ করে তাহারা মহাভাগ্যবান্। ভারতবর্ষ কর্ম্মভূমিও বটে। পাশ্চাত্ত্য সকল দেশ ভোগভূমি। জড় বিজ্ঞানের আলোচনা ও ক্রমোন্নতি তত্রত্য জনগণের ভোগ-বৃত্তিরই পরিতৃপ্তি ও প্রসার করিতেছে এবং উহাই তাহারা উন্নতির পরাকাষ্ঠা মনে করিতেছে। পরদেশ অধিকার পূর্ব্বক-ধনরত্ন লুণ্ঠন ও শোষণ তাহাদের আত্মশ্লাঘার বিষয়। আমাদের দেশের কৃষ্টি ও আমাদের সংস্কার ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত।

পাশ্চাত্ত্য দেশের যোগীদের প্রসঙ্গে মনে পড়ে শ্রীশ্রীবাবা একদিন বলিয়াছিলেন, এ দেশে খ্যাতিমান্ ঐরূপ এক ব্যক্তির সহিত জ্ঞানগঞ্জের মহাযোগী শ্রীশ্যামানন্দ পরমহংস সাক্ষাৎ করিলে পরস্পর আলাপ কালে তিনি অনুভব করিলেন ঐ ব্যক্তি স্বীয় শক্তি দ্বারা তাঁহার শরীর হইতে বিশুদ্ধ তাড়িত টানিয়া লইতেছেন। তখন তিনি উঁহার শক্তির ক্রিয়া রোধ করিয়া বলেন, যে তিনি তাঁহার অপহৃত তাড়িত স্বদেহে পুনরায় আকর্ষণ করিতেছেন এবং ঐ প্রক্রিয়ায় উঁহার দেহস্থ তাড়িতও তাঁহার দেহে চলিয়া আসিবে। উহা রোধ করিবার ক্ষমতা তাঁহার (সাহেবটির) নাই। শুনা যায় পরে ঐ ব্যক্তিটি বাত ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া ইহলোক ত্যাগ করেন।

আমাদের অনেকের ধারণা ছিল সাধন করিতে হইলে সংসার

ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হওয়া অত্যাবশ্যক এবং গভীর অরণ্যে ও পর্ব্বতগুহাদিতে বাস করিয়া কৃচ্ছ্র সাধন করিতে হয়, অন্যথা সিদ্ধিলাভ অসম্ভব। শ্রীশ্রীবাবা বলিতেন, সংসার ত্যাগ করিয়া পিতামাতা ও স্বজনের মনে কষ্ট দেওয়াই হয়, স্ত্রী-পুত্রাদির ভরণপোষণের দায়িত্বও পরের স্কন্ধে নিক্ষেপ করিতে হয়। অথচ সন্ন্যাসীকেও আহার সংস্থানের জন্য যথেষ্ট ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়, অরণ্যে হিংস্র জন্তু প্রভৃতি হইতে আত্মরক্ষা করিতেও বেগ পাইতে হয়। গৃহে অবস্থান করিয়া যথাবিধি কার্য্য করিলে ঐ সকল অসুবিধা পরিহার করিয়াই সিদ্ধিলাভ করা যায়।*

শ্রীশ্রীবাবা বলিতেন মনুষ্যেতর জীবগণ আজীবন কেবল প্রারব্ধ কর্ম্মেরই ফলভোগ করে। মানুষ কর্ম্ম দ্বারা কর্ম্ম ক্ষয় করিতে পারে। এই মর্ম্মে তাঁহার স্বরচিত একটি গানও শুনিয়াছি। সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ কর্ম্ম বহুলাংশে এবং প্রারব্ধও আংশিকভাবে খণ্ডন মানুষের সাধ্য। সেইজন্য বাবা বলিতেন তাহার ক্রিয়াবান্ শিষ্যদের কোষ্ঠী বা কররেখা দেখিয়া কেহ তাহাদের ভবিষ্যৎ ঠিক ঠিক বলিতে পারিবে না। ক্রিয়া দ্বারা কররেখারও পরিবর্ত্তন হয়, কোষ্ঠীর গণনায় ব্যতিক্রম ঘটে।

কতদিনে যোগ-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা যায় এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিয়াছেন, তোমরা যে বিদ্যার সাধনা কর, তাহার

---

* শ্রীশ্রীবাবা সর্ব্বদাই শ্রোতার অধিকারের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যথাযোগ্য উপদেশ দিতেন। তাঁহার বহু সন্ন্যাসী শিষ্যও ছিল ইহা তাঁহার স্বমুখ হইতেই শুনা গিয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে কয়েকজনকে দেখাও গিয়াছে। সম্পাদক

প্রথম সোপান এন্ট্রেন্স (প্রবেশিকা) পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইতে কত সময় ও পরিশ্রম লাগে তাহা ভাবিয়া দেখ। বিশেষ পরিশ্রম করিয়া একটা ডিগ্রী লাভ করিলেও কেহ বিদ্যাবিশারদ হয় না। সাধারণ বিদ্যা-সাধনা হইতে যোগ সাধনা বিশেষ দুরূহ। তবে যোগ-সাধনায় যে সকল নিয়মাদি পালন করা কর্ত্তব্য তাহা যথাবিধি পালন করিলে প্রকৃতি সাধকের সহায়তা করেন, সাধকের দেহ সুস্থ থাকে এবং মন স্থিরতার পথে আসিতে থাকে, দুঃখ ও অভাবের তাড়না মন্দীভূত হয়।

সাধন পথে নিষ্ঠা ও একাগ্রতার একান্ত প্রয়োজন। একাগ্রতা অবশ্য ইষ্টচিন্তায় হইবে, কাম-চিন্তায় নয়। একটি সত্য ঘটনার কথা বলি। আমাদের একজন খ্যাতনামা কর্ম্মী গুরুভ্রাতা তরুণ বয়স হেতু একটি যুবতীর রূপে মুগ্ধ হন। ফলে তিনি ক্রিয়ায় বসিলে যুবতীর রূপই তাঁহার মনে আসিত। এই মহাবিঘ্ন হইতে উদ্ধার কামনায় তিনি মনে মনে বাবার কাছে প্রার্থনা করিতেন, কিন্তু পত্রদ্বারা সে কথা তাঁহাকে নিবেদন করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেন। একদিন তিনি ক্রিয়াকালে বিশেষ ব্যাকুল হইয়া শ্রীশ্রীবাবার শরণাপন্ন হইলে বাবা সূক্ষ্মদেহে আসিয়া দেয়ালে তাঁহার যে ছবিখানি ঝুলান ছিল তাহা খুলিয়া লইয়া তদ্দ্বারা গুরুভাইটির কপালে আঘাত করিয়া উহা সশব্দে তাঁহার পার্শ্বে ভূমিতে ফেলিয়া চলিয়া যান। এই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপারে, বিশেষতঃ উচ্চ স্থান হইতে পতিত ছবির কাচ অভগ্ন দেখিয়া গুরুভ্রাতাটি বিস্ময়াপন্ন হন। একদিন পরে কাশী হইতে লিখিত বাবার পত্রে সকল বিষয় অবগত হন। বাবা

লিখিয়াছিলেন, "আর কখনও ঐরূপ কদর্য্য চিন্তায় মন দিও না।"

শ্রীশ্রীবাবা বলিতেন, সর্ব্বদা সদাচরণ করিবে এবং সৎসঙ্গে থাকিতে চেষ্টা করিবে। পাপের পথ বড়ই পিচ্ছিল, একবার সেদিকে পা বাড়াইলে সামলাইতে পারিবে না। পাপ চিন্তা ও কুশব্দ উচ্চারণও নিষিদ্ধ। এ বিষয়ে আমার নিজ জীবনের একটি গল্প বলিব। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে আমার তরুণ বয়সে হরিদ্বারে একদিন অপরাহ্নে আমি গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া জলে সঞ্চরণশীল মৎস্যদের ভোজনের জন্য আটার কতকগুলি লেট্টি হাতে লইয়া একটি একটি করিয়া জলে ছুড়িয়া মারিতেছিলাম এবং মুখে বলিতেছিলাম "মার্, মার্।" হঠাৎ আমার পশ্চাৎ হইতে আমাকে সম্বোধন করিয়া কেহ বলিলেন, "বাবা, জীবকো জব খিলাতা হ্যায় তো কাহে আপন জীউ খারাপ করতা হ্যায়।" পশ্চাতে ফিরিয়া দেখি এক জটাজুটধারী সহাস্যবদন সন্ন্যাসী। আমি তাঁহার দিকে চাহিতেই তিনি বলিলেন, "বাতঠো উল্টাইকে বলো না।" মার্ শব্দটি উল্টাইলে রাম হয়, তিনি মার্ মার্ না বলিয়া "রাম রাম" বলিতে ঐ ভাবে উপদেশ দিলেন। আমি রাম নাম উচ্চারণ করিয়া কয়েকটি লেট্টি ছুড়িয়া পশ্চাতে চাহিয়া দেখি সন্ন্যাসী অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন।

বাবার মুখে পুনঃ পুনঃ শুনা গিয়াছে কর্ম্ম হইতে জ্ঞান জন্মে, জ্ঞান হইতে ভক্তির উদয় হয়। এই ভক্তিই প্রশস্ত, উন্মাদিনী ভক্তি চঞ্চলা। কর্ম্ম করিতে করিতে জ্ঞান অর্জ্জন করিবে। জ্ঞান অর্জ্জনের ফলে কর্ম্মে আসক্তি জন্মিবে, উহা হইতেই ভক্তির

উদয় হইবে। সেই ভক্তিই প্রকৃত ভক্তিপদবাচ্য। কর্ম্মের নিয়মিত অনুশীলনে জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধি পাইবে এবং ভক্তির গভীরতা বাড়িতে থাকিবে এবং উহা অচলা ভক্তিতে পরিণত হইবে।

আহার সম্বন্ধে শ্রীশ্রীবাবার উপদেশ ছিল, যে খাদ্যে শরীর গরম হয় তাহা সাধকের বর্জ্জনীয়। পেঁয়াজ ও ডিম এই কারণেই নিষিদ্ধ ভোজন। দীক্ষা দানের পরে রক্ষা-কবচ হিসাবে বাবা একটি তাম্র মাদুলী মধ্যে শিষ্যের ইষ্ট কবচ পুরিয়া তাহাকে তাহা ধারণ করিতে দিতেন এবং বলিতেন সে যেন কখনও পেঁয়াজ না খায়. নিমন্ত্রণে বা হোটেলে অসাবধানে পেঁয়াজ খাওয়া হইলে তাম্র মাদুলী হইতে ইষ্ট কবচ অলৌকিক ভাবে অদৃশ্য হইত। ইহা অনেকেরই প্রত্যক্ষ। আহার সম্বন্ধে অন্য বিশেষ কিছু বিধি নিষেধ নাই। আহারের পর শিষ্যদিগকে বাবা নিজ শ্রীহস্তে পান বিতরণ করিতেন; বলিতেন, উহাতে মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট হয় এবং পরিপাকেরও সহায়তা হয়।

শ্রীশ্রীবাবা স্বয়ং তিক্ত ঝোল খাইতেন। বলিতেন উহা মৃদুরেচক ও ক্রিমিনাশক। তিনি ব্যঞ্জনাদি পৃথক্ পৃথক্ সেবা করিতেন না, অন্নসহ সকল ব্যঞ্জন এবং দধি মিশ্রিত করিয়া গ্রহণ করিতেন। তাঁহার আহারের পরিমাণও অল্প ছিল। পানীয় জল সম্বন্ধেও তাঁহার সতর্ক দৃষ্টি ছিল। পুরী আশ্রমের কূপের জলে ফোকাস করিয়া ভুবনেশ্বরের কেদার-গৌরী প্রস্রবণের সহিত উহার সংযোগ সাধন করিয়াছিলেন। তাহার ফলে ঐ কূপের জল অতি সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর হয় এবং উহার সেই গুণ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

পুরী আশ্রম প্রসঙ্গে মনে পড়ে একবার তথায় বাবা এক ভীষণ বিষধর সর্প দেখিয়া আমাদের আতঙ্কপূর্ণ প্রবল নিষেধ সত্ত্বেও একাকী উহার সম্মুখীন হন এবং হস্তসঙ্কেতে উহাকে ডাকিয়া নিজের অতি নিকটে আনয়ন করেন। পরে উহা তাঁহার হস্তসঙ্কেতেই উদ্যত ফণা নত করিয়া মন্ত্রমুগ্ধবৎ ভূতলে স্থাপন করে এবং ক্রমে তাঁহার আদেশে প্রাচীরের এক কোণের মুহুরি দিয়া বাহির হইয়া যায়। উহা সদর রাস্তা অতিক্রম করিবার সময় আমাদের কোলাহলে আকৃষ্ট পুলিশের এক সাহেব ইন্সপেক্টর বাবার নিষেধ সত্ত্বে পুনঃ পুনঃ গুলি করিয়াও উহাকে বিদ্ধ করিতে পারে নাই। উহা নিরাপদে ফণী মনসার জঙ্গলে ঢুকিয়া যায়।

পুরী আশ্রমে একবার দুইটি সাহেব শ্রীশ্রীবাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া তাঁহার বিভুতি দর্শন করিতে চাহিলে তিনি একজনের হস্তস্থিত একটি বেলফুলকে হলুদবর্ণের গাঁদায় পরিণত করেন এবং তৎপর তাহাদের বিশেষ আগ্রহে উহাকে সুগন্ধ গোলাপে রূপান্তরিত করিয়া দেন।

একবার আমার পঞ্চবর্ষ বয়স্কা একটি ডিপ্‌থিরিয়া রোগে আক্রান্ত মুমূর্ষু কন্যা শ্রীশ্রীবাবার পরম কৃপায় অতি সত্বর আরোগ্য লাভ করে। হাসপাতালে তাঁহার সম্পূর্ণ জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে সে বলে যে, সে কতদিন বা কতক্ষণ জানে না, বরাবর বাবার কোলেই শুইয়াছিল এবং বাবা তাহার মুখে ও বুকে তাঁহার লম্বা দাড়ি বুলাইয়া বলিতেন, "তোমার কোনও ভয় নাই, তুমি শীঘ্র ভাল হইয়া যাইবে।" পর বৎসর স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য তাহাকে

পুরী লইয়া যাওয়া হইলে শ্রীশ্রীবাবা স্বদেহ হইতে একটি স্ফটিক গোলক নিষ্কাষিত করিয়া তাহার দক্ষিণ বাহুর কনুইয়ের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দেন এবং বলেন ঐ স্ফটিকের গুণে মেয়েটির স্বাস্থ্য ভাল হইবে। তাহাই হয়। সে মেয়ের বর্ত্তমান বয়স আটত্রিশ বৎসর।

যোগ ও স্বাস্থ্য

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীশ্রীবাবা বলিতেন "যোগ অতি স্বাভাবিক জিনিষ। খাইতে কষ্ট হয়, তবু যোগ করিতে কষ্ট হয় না।" আমারও পূর্ব্বে ধারণা ছিল যোগ একটা অতি উৎকট রকমের কিছু। শ্রীশ্রীবাবার শ্রীচরণে আশ্রয় পাইবার পর হইতেই সে ধারণা আর নাই। যোগ স্বাভাবিক তাহারই জন্য যে বাল্যকাল হইতে প্রাকৃতিক নিয়মগুলি পালন করিয়া আসিয়াছে। তাই বলিয়া যে অজ্ঞানবশতঃ প্রকৃতির বিরুদ্ধে চলিয়াছে তার হতাশ হবার কোন কারণ নাই। প্রকৃতির বিরুদ্ধে চলিলে দণ্ডভোগ করিতেই হইবে। প্রকৃতি মাতা বড় কঠোর, তাঁহার কাছে ক্ষমা নাই, কারণ মা বেশ জানেন যে ক্ষমা করিলে সন্তান আরও বিগড়ে যায়। অতএব যখন আমরা কোন কষ্ট বা দণ্ড ভোগ করি, তখন আমাদের বোঝা উচিত যে এই দণ্ড আমাদের পরম মঙ্গলের জন্য। যে বার বার মায়ের মা'র খেয়েও শোধরায় না তাকে মা একেবারে সরাইয়া দেন আবার সেটাকে নূতন করিয়া গড়িতে। একেই আমরা বলি অকাল-মৃত্যু। এই অকাল-মৃত্যুর কারণ তা হলে আমরা নিজেই। আয়ুর কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই, কর্ম্মদোষে আয়ুর ক্ষয় হয় আবার কর্ম্মগুণে উহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

স্বাস্থ্য বলিতে আমরা কি বুঝি? আমরা জানি যে বেশ নানা দ্রব্য খাইয়া হজম করিতে পারে এবং পরিশ্রম করিতে পারে

সে স্বাস্থ্যবান্। কিন্তু স্বাস্থ্য যে কেবল খাওয়া দাওয়ার উপরই নির্ভর করে তা নয়। স্বাস্থ্য নির্ভর করে প্রাকৃতিক নিয়ম পালনের উপর। উত্তম স্বাস্থ্য তাহারই, যে শরীরটাকে একটা বোঝা বলিয়া বোধ করে না। যাহার উত্তম স্বাস্থ্য সে কাম ক্রোধাদি রিপুর দ্বারা অভিভূত হয় না, তার সর্ব্বজীবে দয়া স্বাভাবিক, সে পরহিতে আত্মোৎসর্গ করিতে বিমুখ হয় না, সে নিজের দোষ ও ত্রুটি সংশোধন করিতে সদাই প্রস্তুত, সে সত্যপ্রিয় ও ধার্ম্মিক হয়। ভাল স্বাস্থ্য না হইলে ভাল মন হয় না এবং ভাল মন না হইলে যোগ-সাধনা হয় না। সেই জন্য যোগ-সাধনার জন্য স্বাস্থ্য ভাল হওয়া অতি আবশ্যক। আবার অধ্যবসায়ের সহিত শ্রীগুরুর উপদেশ মত যোগ সাধনা করিলে নষ্ট স্বাস্থ্যেরও পুনরুদ্ধার হয়। তবে নষ্ট হওয়ার একটা সীমা আছে, অর্থাৎ শরীরের কলকব্জাগুলি যদি একেবারে নষ্ট হইয়া না যায় তাহা হইলে তার মেরামত হইতে পারে। এই মেরামতের কার্য্য যে কেবল ঔষধ সেবনেই হয় তা নয়। ঔষধ প্রকৃতিকে সাহায্য করে মাত্র, আসল মেরামত প্রকৃতিই করেন। আমরা আমাদের শরীর যতটা ক্ষণভঙ্গুর মনে করি, বস্তুতঃ ততটা নহে। প্রকৃতির অসীম দয়া। তিনি যেমন ক্ষমা করেন না, তেমনি শরীরকে এরূপভাবে তৈরী করিয়াছেন যে তাহার ভিতর আরোগ্যকারী ক্ষমতাও আছে। যদি আমরা প্রকৃতির নিষেধ শুনি তাহা হইলে বিনা ঔষধেই মেরামতের কার্য্য হইয়া যায়। আর যদি বার বার প্রকৃতির নিষেধ অবজ্ঞা করি তাহা হইলে শরীরটি

ত্যাগ করিতে হয়, পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইহাই অকাল-মৃত্যু। আমাদের এ ভবে আসা কেবল খাবি খাইয়া মরিবার জন্য নয়, আমাদের ভবে আসা যাহাতে মরণের শেষ হয়।

আমরা যে কত রকমে প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করি তাহার ইয়ত্তা নাই। সর্ব্বাগ্রে আমাদের আহারের কথা ধরা যাক্। আমরা প্রায়ই অতি ভোজন করিয়া ফেলি। শ্রীশ্রীবাবা বলিতেন, "আমার বাপু হাঁউ হাঁউ ক'রে কতকগুলো খাওয়ার অভ্যাস নেই।" বাস্তবিক এই হাঁউ হাঁউ ক'রে খাওয়াই যত রোগের ঘর। কোথাও নিমন্ত্রণ হ'লে তো প্রাণের মায়া এক প্রকার ছাড়িয়াই দিই। আমি বেশ দেখিয়াছি যেদিন একটু খাওয়া বেশী হইয়া যায় সেই দিন ভাল ক্রিয়া হয় না। আহার এ রকম হওয়া উচিত যাহাতে শরীরে কোন প্রকার অস্বস্তি বোধ না হয়, উদরে বায়ুসঞ্চয় না হয়। শ্রীশ্রীবাবার যে প্রকারের আহার ছিল, যোগাভ্যাসীর সেইরূপ আহারই করা উচিত। আমার পরম সৌভাগ্য হইয়াছিল. এক সময়ে (বাবা যখন আউধগরবীর আশ্রমে থাকিতেন) বাবাকে নিজ হাতে রন্ধন করিয়া কয়েকদিন ভোগ দিতে। তাইতে আমি জানি বাবার কি প্রিয় ছিল। বাবা হলুদ ও জীরা ভিন্ন অন্য কোন মসলা খাইতেন না, বাবা কাঁচা মুগের ডাল তাতে কাঁচা পেঁপে দিয়া বড় ভালবাসিতেন, বাবা আলু খাইতেন না। পটল, ফুলকপি ও মটরশুঁটি খাইতেন,—এ সব খাইতেন ঝোলের সহিত। বাবার আর একটি প্রিয় জিনিস ছিল ভাল ওল বা মানকচু—ওল সিদ্ধ করিয়া কাটিয়া ভাজা, মানকচুর ঝোল বা মানকচু ভাতে।

এই সবই যোগাভ্যাসীর প্রকৃত আহার। বাবা যে দ্রব্যগুলি যে রূপে খাইতেন, আমি বাল্যকাল হইতে সে জিনিসগুলি ঐ রকম ভাবেই খাইতে ভালবাসি। যদি আমাদের কোন ভ্রাতা বা ভগিনী বাবার ভোগ দেন, তাঁহারা যেন ঐ সব দ্রব্য ঐ রকম ভাবে করিয়া দেন, তাহাতে বাবার বড় তৃপ্তি হইবে। যোগীর আহারে কোন আড়ম্বর নেই, ব্যয় বাহুল্য নেই। স্বাস্থ্য ভাল রাখিতে হইলে যোগীর মতই আহার করিতে হয়। আহারে সংযম না থাকিলে অন্যান্য বিষয়েও সংযম রক্ষা করা দুষ্কর। আহার-শুদ্ধি না হইলে চিত্তশুদ্ধি হয় না, চিত্তশুদ্ধি না হইলে যোগাভ্যাস হয় না। শ্রীশ্রীবাবা বলিতেন "যোগাভ্যাস করতে হ'লে কু-অভ্যাসগুলো ছাড়তে হয়।"

যোগাভ্যাসীর কোন নেশার বশীভূত হওয়া উচিত নয়। সকল নেশাই মৃত্যুর দূত, অতএব চিত্তের বিক্ষিপ্তিকারক। কতকগুলি নেশা শরীরকে ধীরে ধীরে ক্ষয়ের দিকে নিয়ে যায় (slow poison), যেমন চা ও তামাক। অন্যান্য বড় নেশার তো কথাই নেই। আজকাল অভ্যাসবশতঃ লোকে মনে করে যে চা আর তামাক কি আবার নেশার মধ্যে নাকি? তাহারা জানে না যে এ দুটি নেশা মানুষের পরম শত্রু। চা খারাপ করে হজমশক্তি, হৃৎপিণ্ড এবং মস্তিষ্ক, যেগুলি শরীরের প্রধান যন্ত্র। আর যাহারা তামাক সূর্ত্তি জর্দ্দা পানের সঙ্গে খায় তাহারা সকলেই জানে যে ইহা মুখে দিলেই নেশা, পেট পর্য্যন্ত যাবারও দরকার হয় না, মুখে দেওয়া মাত্র মুখ, চোখ, কাণ সব গরম হইয়া ওঠে। তা'হলে দেখা যাইতেছে এটা কি

ভয়ানক বিষ। তামাকের ভিতর যে বিষ আছে সেটা সর্পবিষের অপেক্ষাও তীব্র। হুঁকার নলচের ভিতর যে কা'ট জমে, সেই কা'ট ছোলা পরিমাণ খাওয়াইলে সাপের বিষ নষ্ট হয়। তামাক চক্ষুর পক্ষে অতীব হানিকর। আর একটা মহাদোষ এই দুইটি নেশার আছে—ইহাতে স্নায়বিক দুর্ব্বলতা এত বাড়ে যে লিখিতে গেলে হাত কাঁপে, ক্রমে স্নায়ুর কেন্দ্র মাথাও কাঁপে। আর একটি জাতি-ধ্বংসকর দোষ আছে, ইহা শুক্রবিকৃতিকারক। কেহ যেন ইহা না মনে করেন যে পাশ্চাত্ত্য দেশে তো এ দুটি নেশা খুব চলে, সেখানে তো বিশেষ কোন ক্ষতি দেখা যায় না। যাঁহারা এ কথা বলেন তাঁহারা ভুলিয়া যান যে আমরা ভারতবাসী, আমাদের দেশ গ্রীষ্মপ্রধান, তার উপর দরিদ্র, পুষ্টিকর খাদ্যের সংস্থান নেই। অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন যে গাঁজা খাইলে বিশুদ্ধ গাওয়া ঘী, মালাই, রাবড়ি আদি দ্রব্য খাইতে হয়, নতুবা পাগল হইয়া যায়, না হয় যকৃৎ শুকাইয়া মারা যায়।

সকল নেশারই দোষ—ব্রহ্মচর্য্য থাকে না। যোগাভ্যাসীর জন্য ব্রহ্মচর্য্য একান্ত আবশ্যক, ইহা শ্রীশ্রীবাবার মুখে শতবার শুনিয়াছি। আমাদের গুরুভাইদের মধ্যে এমন সৌভাগ্যবান আছেন, যাঁহারা যেদিন হইতে দীক্ষা পাইয়াছেন সেদিন হইতেই কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন এবং যোগমার্গে যথেষ্ট উন্নতিও করিয়াছেন। যদিও তাঁহারা প্রচ্ছন্নভাবে থাকেন, তথাপি একটু লক্ষ্য করিলে বোঝা যায়। কাহারও গুণের কথা বলিতে কোন বাধা নেই। আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে এখন

শ্রীশ্রীবাবার স্থূল শরীরের অবর্ত্তমানে এই সব উন্নত গুরুভাইদিগকে আমাদের আদর্শরূপে সম্মুখে রাখিয়া কার্য্য করিয়া যাওয়া উচিত। বয়সে বড় হলেই তো বড় হয় না, জ্ঞানে যে বড় সেই আসলে বড়।

শ্রীশ্রীবাবা বলিতেন "বায়ুই আমাদের রোগ।" অতএব এই বায়ুকে প্রকৃতিস্থ না রাখিলে কোন কার্য্য হয় না। নাভির নিম্নে অপান বায়ুর স্থান। এই অপান বায়ু ঠিক না থাকিলে শরীরে নানা উপদ্রব উপস্থিত হয়। আহারের দোষে ঠিক হজম না হইলে এই অপান বায়ু বিকৃত হয়। এই বায়ুকে ঠিক রাখিবার জন্য একটি ক্রিয়া আছে, তাহা অনেকেই বোধ হয় জানেন। সে ক্রিয়ার নাম "মূলশোধন।" মূলশোধন যোগীর প্রাণ। এ ক্রিয়া খুবই সহজ। মলত্যাগ করিবার পর অথবা যে কোন সময়ে শরীর গরম বোধ হয়, শৌচ করিবার সময় বাম হস্তের মধ্যমাঙ্গুলিটি সমস্ত মলদ্বারে প্রবেশ করাইয়া বার বার শীতল জল দিয়া ধৌত করিতে হয়, আঙ্গুলে একটু তেল লাগাইলে সুবিধা হয়। তারপর পাঁচ সাত বার অশ্বিনীমুদ্রা করিতে হয়। অশ্বিনীমুদ্রা আর কিছুই নয়, মলদ্বারটি বার বার কুঞ্চিত করা ও প্রসারিত করা। এই অশ্বিনীমুদ্রার আর একটি বিশেষ গুণ আছে,—ইহা করিলে অন্ত্রবৃদ্ধি রোগ হইতে পারে না এবং যাঁহাদের হইয়াছে তাঁহারাও ধীরে ধীরে আরোগ্যের পথে যাইতে পারেন।

আর একটা জিনিস স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষ আবশ্যক। সেটি হইতেছে ব্যায়াম। ব্যায়াম বলিতে যেন কেহ পালোয়ানি ব্যায়াম

না বোঝেন। যোগ যেমন স্বাভাবিক, ব্যায়ামও তেমনি স্বাভাবিক। যাঁহারা আসনাদি অভ্যাস করেন, তাঁহাদের জন্য অন্য ব্যায়ামের আবশ্যকতা নাই। যাঁহারা তাহা না করেন তাঁহাদের বয়সোপযোগী কিছু ব্যায়াম করা উচিত, নতুবা শরীর কর্ম্মঠ থাকে না, শীঘ্রই শরীর থল্‌থলে বাতগ্রস্ত হইয়া যোগাভ্যাসের অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে। কোন ব্যায়াম সুবিধা না হইলে অন্ততঃ প্রাতঃকালে আহ্নিকের পর এবং বৈকালে সাধ্যমত বেড়ানো ভাল। যাঁহারা চাকুরী করেন তাঁহাদের বেড়াইবার সময় থাকে না, তাঁহারা প্রাতে আহ্নিক করিবার পর এবং সন্ধ্যায় আহ্নিকের পূর্ব্বে একটু উঁচু জানালা বা তক্তাপোষের উপর দুইটি হাত খুব কাছাকাছি রাখিয়া, পা দুইটিও কাছাকাছি রাখিয়া ও টান-টান করিয়া আস্তে আস্তে ঝাঁকানি না দিয়া সহ্য মত দশ পনের বার বুক ডন দিবেন, বুক বেশী নীচু হইবে না, কোমরের দিক্‌টাই একটু যতটা সম্ভব নীচু হইবে। ইহাতে তলপেট ও মূত্রযন্ত্রের ব্যায়াম হইবে, কারণ একটু বয়স হইলে এই দুইটি যন্ত্র বড় শীঘ্র বিগরায়। আর একটা উপকার হইবে—হাঁটুতে বাত হইবে না। স্বর্গীয় পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়জী আশী বৎসর বয়সেও ব্যায়াম করিতেন। খুব বেশী বয়স হইলে আবার বিছানায় শুইয়া-শুইয়া ব্যায়াম আছে। খুব শৈশবে আর খুব বার্দ্ধক্যে এই শুইয়া-শুইয়া ব্যায়ামই উপযোগী। শিশুদের দেখিলেই সেটা বেশ বোঝা যায়।

স্বাস্থ্য ভাল রাখিয়া শ্রীগুরুর উপদেশ মত কার্য্য করিয়া গেলে বিপথে যাইবার ভয় থাকে না এবং শুদ্ধ বিচারের শক্তি জন্মায়। ঐ শুদ্ধ বিচার শক্তি দ্বারা মানুষ যে কত উন্নতি করিতে পারে

তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। যোগের উদ্দেশ্যই হইতেছে প্রকৃত মানুষ হওয়া। আগে ঘরটি ঝাড়িয়া মুছিয়া তবে সাজাইতে হয়; নোংরা ঘর সাজাইলে কি ভাল দেখায়? আমাদের এই দেহরূপ ঘরটিকে এমন পরিষ্কার রাখিতে হইবে যাহাতে ইহা ইষ্টদেবতার বাসোপযোগী হয়। সেই ঘরে মন রূপ আলোটি জ্বালিয়া সর্ব্বদা তাঁহাকে ডাকা চাই। এইরূপ ভাবে ডাকিলে তিনি না আসিয়া থাকিতে পারেন না।

শ্রীশ্রীবাবা আর একটি কথা বলিতেন—"সমসূত্র না থাকিলে কেহ সংসারে সুখী হইতে পারে না।" এই সমসূত্রতা গৃহস্থ যোগীর পক্ষে বিশেষ আবশ্যক, কারণ তাঁহাকে দশটিকে নিয়া ঘর করিতে হয়। শ্রীশ্রীবাবা এই সমসূত্রতা অতুলনীয় ভাবে দেখাইয়া গিয়াছেন। সকল শিষ্যই তাঁহার কাছে সমান আদর পাইত। তাঁহার কাছে বড় ছোট ছিল না। শ্রীশ্রীবাবা যখন আউধ গরবীর আশ্রমে ছিলেন তখন আমি তাঁহার কাছে আবেদন করিয়া রাখিয়াছিলাম যে তিনি যখন মালদহিয়া আশ্রমে যাইবেন তখন এই আউধ গরবীর আশ্রমে যেন আমাকে থাকিতে দেন। তিনি স্বীকৃত হইয়াছিলেন। তারপর অনেকে বাবাকে বেশী ভাড়া দিয়া ঐ বাড়ী চাহিয়াছিলেন। বাবা কিন্তু কাহাকেও না দিয়া আমাকে একদিন ডাকিয়া বলিলেন, "নরেন্দ্র, আগামী কাল থেকে তুমি ঐ আশ্রমে এসো।" আমি বাবাকে প্রণাম করিয়া তাহার পরদিনই যথাসাধ্য কুমারী ভোজন করাইয়া আশ্রমে গেলাম। পনের বৎসর ঐ বাড়ীতে ছিলাম। তাহার পর বাবার আশীর্ব্বাদে নিজের বাড়ীতে গেলাম। কথা নড়চড়ের উপর বাবার অতিশয়

বিরক্তি ছিল। আমাকে বাড়ী দিবার জন্য স্বীকৃত হইবার পর যখন কেহ বাড়ী চাহিয়াছেন তখন বলিতেন, "আমি কি বিজন্মা যে নরেন্দ্রকে দিব বলিয়া সে বাড়ী অন্যকে দিব ?"

আমার স্বর্গীয়া কন্যা শান্তিকে বাবা বড়ই স্নেহ করিতেন। তাহাকে বলিতেন, "তুই আমার আর জন্মের বৌ ছিলি।" এই বলিয়া তিনি চাবির গোছাটা তাহার কাছে ফেলিয়া দিয়া বলিতেন, "এই নে, ঐ আলমারীর থেকে তোর যা ইচ্ছা হয় নিগে যা।" শান্তিও যখন বাবার পা দুখানি কোলের উপর নিয়া তার লম্বা কেশরাশি দ্বারা আবৃত করিয়া বসিত, সে যেন তার এক ধ্যানমগ্ন অপূর্ব্ব অবস্থা। যে আষাঢ়ে বাবা দেহরক্ষা করিলেন তাহার পরেরই দোল পূর্ণিমার আগের দিন বাবা তাঁহার শান্তিকে নিজের কাছে ডাকিয়া নিলেন। সে নিজ স্বামীর কাছে আমেদাবাদে দেহরক্ষা করিয়া বাবার কাছে চলিয়া গেল একটি দেড় বৎসরের পুত্র রাখিয়া।

আমাকে পুরাতন আশ্রম দেওয়া ও শান্তিকে ডাকিয়া নেওয়া, এই দুইটি বৃত্তান্ত হইতে জানা যায় যে বাবার স্নেহ কত গভীর ও অকৃত্রিম ছিল। প্রকৃত যোগী ভিন্ন এরূপ ভালবাসা কি অন্যত্র আশা করা যায় ? সকল শিষ্যকেই বাবা "প্রাণাধিক" বলিয়া নাম লিখিতেন। ইহা কেবল কথার কথা নয়। শিষ্যরা বাস্তবিক যে তাঁহার প্রাণের চেয়েও অধিক ছিল সে তো বাবা শিষ্যদের জন্য শরীর দিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। বাবার সিদ্ধ শরীরে কি কোন রোগের সম্ভাবনা ছিল ? শিষ্যদের কঠিন কঠিন রোগ টানিয়াই তো তাঁহার শরীর রোগগ্রস্ত হইল। আবার যখন তাঁহার

শরীর রোগগ্রস্ত হইল, তখন ডাক্তাররা গেলেন তাঁহার চিকিৎসা করিতে। হায়! সে দিব্যশরীরের চিকিৎসা কি এ পৃথিবীর ডাক্তারের কাজ? যে শরীর ক্ষণমাত্রে অদৃশ্য হইত আবার ক্ষণমাত্রে দৃশ্য হইত, যে শরীর একই সময়ে বহু শিষ্যের ঘরে বিরাজ করিত, যে শরীরকে কুকুরের বিষ ও সাপের বিষ নষ্ট করিতে পারে নাই, সে শরীর কি মনুষ্য শরীর যে তাহার চিকিৎসা মানুষে করিবে? মানুষের ধৃষ্টতাও বড় কম নয়! মনুষ্য-শরীর দেব-শরীরে পরিণত হওয়া নির্ম্মল স্বাস্থ্য ও যোগাভ্যাসেরই উপর নির্ভর করে। তাই বলি নির্ম্মল স্বাস্থ্য ও যোগ একটি আর একটিকে ছাড়িয়া হয় না।

নববর্ষ

রায় সাহেব শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত, কবিরত্ন, এম-এ

(১৩৬৩ সালের ১লা বৈশাখ তারিখে শ্রীশ্রীগুরুদেবের কলিকাতা ভবানীপুর আশ্রমে গুরুভ্রাতা ও ভগিনীগণের প্রীতি সম্মেলন উপলক্ষ্যে নিম্নলিখিত দুইটি গান গীত হইয়াছিল।)

(১)

জয় জয় জয়, হে মঙ্গলময়,
আজি নববর্ষ দিনে
জয় হোক্ নাথ, করি প্রণিপাত
নতশিরে শ্রীচরণে।
বসন্ত বাহারে সাজি ফুলে ফলে
বিটপী ঘোষিছে জয়,
জয় জয় কার উঠিছে গগনে
পাখীর কাকলী সনে।
নীরস কঠোর মোদের জীবনে,
হে চির সরস, জয়
হউক তোমার, আজি এসে বস
হৃদয়-পদ্মাসনে ।
মঙ্গলময়, মঙ্গল কর,
দেহ তব পদে রতি,
জয় গুরু জয় গাহিব সকলে
একতানে একমনে।

(২)

মধুর নবীন বরষে, হে নাথ, বরিব তোমারে আজি,—
হৃদয়ে বরিব, জীবনে বরিব, বরিব বরিব আজি।
অমল তোমার চরণ-যুগল বসাব হৃদয়-পদ্মে,
নয়ন সলিলে ধুইয়ে সঁপিব অজপা কুসুমরাজি।
পরাণ-পবন হইবে শান্ত স্মরিয়া মোহন হাসি,
করযোড়ে তব দাঁড়াব সমুখে চরণ রেণুতে সাজি।
তোমার তনুর গন্ধ জাগাবে নন্দন-বন বোধ,
অমরার বীণা-মুরলী মুরজ কর্ণে উঠিবে বাজি'।
চিদাকাশে তব দ্যুতি-ঘন রূপ ফুটিবে আঁধার নাশি',
কৃপা কর, নাথ, হইব ধন্য বরিয়া তোমারে আজি।
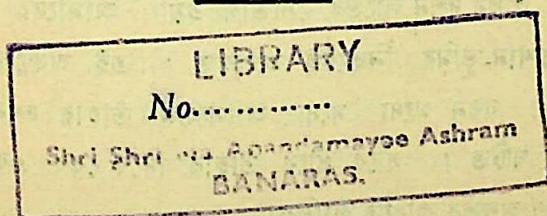
সিদ্ধপুরুষ শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস

স্বামী শ্যামলানন্দ

(শ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ)

বাল্যকাল হইতেই সাধুসঙ্গ করা আমার একটা বাতিকের মধ্যে ছিল। কোনও সাধু-সন্তের আগমনবার্ত্তা শুনিলেই আমার মন তাঁহার দর্শনের জন্য ছুটিয়া যাইত ; এমন কি, কখনও কখনও দুই তিনের জন্য বাড়ী হইতেও পলাইয়া যাইতাম। এইজন্য অনেক সময় বাড়ীতে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত।

কলিকাতার কেওড়াতলার শ্মশানভূমির নিকট শ্রীআনন্দ ঋষির আশ্রমে ৺কৃষ্ণ-কালী মন্দিরে শ্রীশ্রীবাবা বিশুদ্ধানন্দের সহিত প্রথম দর্শন লাভের সৌভাগ্য হয়। আমাদের বাসস্থান এই শ্মশান-ভূমির নিকটেই অবস্থিত। এই অঞ্চলের দিকে স্বামীজী যখন মধ্যে মধ্যে আসিতেন তাঁহার দর্শন লাভ আমার ঘটিত। ধীরে ধীরে তাঁহার দিকে বেশ একটু যেন আকর্ষণ অনুভব করিতে লাগিলাম।

টালিগঞ্জে (কলিকাতা) অবস্থিত ৺করুণাময়ী কালী বাড়ীতে আমি প্রায়ই দেবী দর্শন করিবার জন্য যাইতাম। একদিন সন্ধ্যার প্রায় এক ঘণ্টা পূর্ব্বে এইস্থানে এক সৌম্যমূর্ত্তি সাধুকে দুইজন ভদ্রলোকের সহিত মায়ের দর্শন করিবার জন্য আসিতে দেখিলাম। ঐ সময় আমি মন্দিরের প্রবেশ দ্বারের ভিতর দিকে চুপ করিয়া বসিয়াছিলাম। উক্ত

মহাত্মাটিকে একাকী মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া মনের মধ্যে কেমন একটা কৌতূহল জন্মিল। তিনি সঙ্গীদের না লইয়া মন্দিরের মধ্যে একাকী কেন প্রবেশ করিলেন—এই চিন্তা মনের মধ্যে খেলিতে লাগিল। দেবীর সম্মুখে সাধুটিকে যখন ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে দেখিলাম, মূর্ত্তি হইতে একটি তীব্র দিব্যজ্যোতিঃ নির্গত হইয়া সাধুটির দেহের সহিত যুক্ত হইয়া গেল, এইরূপ স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। কিন্তু সিঁড়ি দিয়া মন্দিরের নিম্নে নামিবার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ আলোক-রশ্মি অদৃশ্য হইয়া গেল, উহা আর দেখিতে পাইলাম না। মন্দির হইতে বাহির হইয়া আসিবার পর আমরা সকলে তাঁহাকে প্রণাম করিলাম এবং আমাদের দেখিয়া বাবাজী সহাস্য-বদনে কহিলেন—"এই মন্দিরের দেবীমূর্ত্তি খুবই জাগ্রত।" কেন তিনি এই কথা বলিলেন আমি তখন বুঝিতে পারিলাম।

কিঞ্চিৎ দূরেই স্বামী কৃষ্ণানন্দ নামক জনৈক বৃদ্ধ অবধূত সাধুর আশ্রম ছিল। তিনি অত্যন্ত উগ্রস্বভাব সম্পন্ন লোক ছিলেন বলিয়া তাঁহার নিকট কেহ গিয়া বসিতে সাহস করিতেন না। দেবী দর্শন পূর্ব্বক বাবাজী এই সাধুটির নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং আমরা দূর হইতে দেখিলাম যে পরস্পরের মধ্যে বেশ কথোপকথন হইতেছে। একটু পরে বাবাজী উচ্চৈঃস্বরে দুইবার 'তারা-শিবানী, তারা-শিবানী' বলিয়া ডাকিলেন। ক্ষণকালের মধ্যে সেইখানে একটি শুভ্র ও একটি কৃষ্ণ বর্ণের শৃগালের আবির্ভাব হইল। হঠাৎ দুইটি বৃহদাকার শৃগালকে দেখিয়া আমাদেরও মনে ভয় হইল। আমরা একটু সরিয়া

দাঁড়াইলাম। শৃগাল দুইটি বাবাজীর পদযুগল চাটিতে লাগিল এবং তিনিও অত্যন্ত স্নেহের সহিত তাহাদের গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন। এইরূপ ভাবে কিছুক্ষণ থাকিবার পর বাবাজী যখন বলিলেন—'এইবার তোরা যা, এইবার তোরা যা', শৃগাল দুইটি বিদ্যুৎবেগে ছুটিয়া গিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। শুনা যায় ঐ আশ্রমে শৃগাল দুইটির মধ্যে মধ্যে আবির্ভাব হয়। কোথা হইতে তাহারা আসে বা আবার কোথায় চলিয়া যায় ইহা রহস্যাবৃত!

স্বামীজী চলিয়া যাইবার পর তাঁহার নাম জানিতে পারিলাম—তিনিই সেই প্রখ্যাত মহাত্মা শ্রীগন্ধবাবা! তাঁহার দেহ হইতে অধিকাংশ সময়ে এক দিব্য সৌরভ নির্গত হয় বলিয়াই সাধারণের নিকট এই নামে তিনি পরিচিত! শ্রীআনন্দ ঋষির আশ্রমে কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহারই দর্শন লাভ হইয়াছিল। যোগশক্তি বিকাশের নানা প্রকার অদ্ভুত কথা তাঁহার বিষয়ে শুনিতে পাইতাম। এইজন্য তাঁহার সৎসঙ্গ করিবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যাকুল থাকিতাম। যোগ-জ্যোতিষ ও অষ্টসিদ্ধি রহস্য বিষয়ে তাঁহার বিপুল দক্ষতা ও সূর্য্য-বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিষয়ে তাঁহার নাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। আমিও ঐ সকল কথা শুনিয়া অত্যন্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইতাম। এই সকল বিষয়ে তাঁহার নিকট কিছু কিছু শিক্ষালাভের জন্য মনের মধ্যে প্রবল আকাঙ্ক্ষাও জাগ্রত হইত।

তাঁহার নিকট যখনই যাইতাম মনের মধ্যে কেমন একটা অবিশ্বাস ও সন্দেহের ভাব সর্ব্বদা জাগ্রত থাকিত, অথচ অন্তরের

মধ্যে তাঁহার প্রতি আমার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। একদিন কুণ্ডুরোডস্থিত ভবনে গিয়া দেখিলাম যে তিনি তাঁহার শুভ্র শ্মশ্রুর একটি কেশ হইতে কেবলমাত্র হস্ত সঞ্চালন দ্বারা দুই এক মুহূর্ত্তের মধ্যে একটি তীব্র গন্ধযুক্ত Napthaline গুলি তৈয়ারী করিলেন। তাঁহার শরীরের রোমকূপ পথে একটি স্ফটিক প্রবেশ করাইয়া দিতেও একদিন দেখিলাম। শরীরের মধ্যে একটা অত বড় পদার্থ কি ভাবে মুহূর্ত্ত মধ্যে চলিয়া যাইতে পারে ও তথায় উহার কি প্রকার অবস্থিতি হয়, তাহা সাধারণের বোধগম্য নহে। 'সূর্য্য-বিজ্ঞানের' সাহায্যে বাবাজী বহু বহু সামগ্রী নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন, এইরূপ কথা শুনিয়াছিলাম; কিন্তু একবার আমার সম্মুখে একটি Lens এর দ্বারা সূর্য্যরশ্মি হইতে (সূর্য্য-বিজ্ঞান) অতি উপাদেয় সন্দেশ প্রস্তুত করিতে দেখিয়াছিলাম। বলা বাহুল্য, উহার কিঞ্চিৎ ভক্ষণ করিবার সৌভাগ্যও আমার হইয়াছিল। যোগ-রহস্য, তীব্র ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ, সূর্য্য-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে বাবাজীর এত প্রগাঢ় জ্ঞান ও অদ্ভুত পারদর্শিতা ছিল যে অশিক্ষিত লোকে উহা ধারণা করিতে না পারিয়া সাধারণের মনের মধ্যে নানারূপ ভ্রান্তির ভাব জাগ্রত করিয়া দিত।

একদিন বেলা দ্বিপ্রহরের পর আমি তিন চারিজন বন্ধুসহ কলিকাতার কুণ্ডুরোডস্থ বাসভবনে শ্রীশ্রীবাবার দর্শনলাভের জন্য গিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন সেইখানে পাঁচ সাতজন ব্যক্তিকে উপস্থিত দেখিলাম। বাবাজীর সম্মুখেই আমরা উপবেশন করিলাম—সামান্য দূরেই। মধ্যে মধ্যে দুই একটি

কথা হইতেছিল। আমরা কেবল চুপ করিয়া তাঁহার দিকে তাকাইয়া বসিয়াছিলাম। মনের মধ্যে এই আকাঙ্ক্ষা ছিল বাবাজী কেমন করিয়া তাঁহার যোগ-শক্তির লীলা দেখান তাহা বুঝিব। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে তাঁহার সুবৃহৎ চৌকির উপর ঠিক আমাদের সম্মুখে ঝপ্ করিয়া শব্দে একখানি সাদাবর্ণের ভারি চিঠির খাম আসিয়া পড়িল। আমরা সকলেই অত্যন্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইতে লাগিলাম। দুই তিনজন ব্যক্তি অতি নিম্নস্বরে বলিয়া উঠিল— 'এ কি ভৌতিক কাণ্ড!' 'কোথা হইতে এই পত্রখানি আসিয়া পড়িল?' কিছুক্ষণ পরে বাবাজী ঐ খামখানি খুলিয়া একখানি চিঠির মত কাগজ বাহির করিয়া উহা খানিকক্ষণ ধরিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন এবং অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বলিয়া উঠিলেন— "এখনই আমাকে যেতে হবে গো!" আমরা স্তম্ভিত হইয়া বসিয়াছিলাম, তাঁহার এই কথার মর্ম্ম ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। তাঁহার মুখের দিকে সকলে তাকাইয়া আছি, হঠাৎ দেখিতে পাইলাম যে বাবাজী তাঁহার ঐ চৌকীর উপর আর নাই; তাঁহার সমস্ত দ্রব্য পড়িয়া রহিয়াছে অথচ তিনি অদৃশ্য! বাবাজীকে তাঁহার আসন ত্যাগ করিয়া কোথাও যাইতে হইলে আমাদের সকলের সম্মুখ স্থান দিয়া ব্যতীত অন্য কোন পথ ছিল না;—অথচ কিরূপে তিনি অন্তর্দ্ধান হইলেন! ইহা দেখিয়া আমরা সকলে বিমূঢ় হইয়া গেলাম। এইভাবে অনেক সময় চলিয়া গেল—বাবাজীর দেখা নাই। আমরা প্রত্যেকেই ব্যস্ত হইয়া উঠিতেছি—কিরূপেই বা ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া

যাই। সকলেরই মনে এই ভাব তীব্র হইয়া উঠিতেছিল, কখন বাবাজী আবার আসিবেন এবং কোন্ দিক্ দিয়া আসিবেন। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে চৌকির দিকে তাকাইয়া আছি ও সব দিক্ লক্ষ্য করিতেছি। হঠাৎ দেখি, বাবাজী ঠিক তাঁহার পূর্ব্বেকার স্থানেই উপাবিষ্ট রহিয়াছেন। তিনি একটু উচ্চস্বরে হাসিয়া কহিলেন, "কি গো, কেমন সব ?" যেন কতদিন পরে তাঁহার সহিত দেখা হইল—ঠিক সেই ভাব! কিরূপে তিনি অন্তর্দ্ধান হইলেন, কোথায় যাইলেন, আবার কিরূপে অলক্ষ্যে ফিরিয়া আসিলেন—এই সকল কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে আমাদের কাহারও সাহস হইল না, যদিও ঐ বিষয়ে তাঁহাকে প্রশ্ন করিবার আমাদের খুব আগ্রহ ছিল। কিছুক্ষণ পরে, বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে, বন্ধুসহ আমি বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম। ব্যাপারটি কি, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

(২)

শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেবের নশ্বর স্থূল শরীরের শেষ পবিত্র স্মৃতিটুকু আমার মানস-পটে এখনও ভাসিয়া বেড়াইতেছে। সেই চিত্র যেমন মর্ম্মান্তিক, তেমনই রহস্যজনক। রাত্রিতে আহারের পর শয়নের ব্যবস্থা করিতেছি, এমন সময় হঠাৎ শুনিতে পাইলাম যে পরমহংসদেব ঐ দিন বিকাল বেলাতেই দেহরক্ষা করিয়াছেন এবং তাঁহার দেহের শেষকৃত্য সম্পাদন করিবার জন্য কেওড়া তলার শ্মশান ঘাটে উহা আনীত হইয়াছে। এই দুঃসংবাদ শুনিয়া আমি যে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলাম ইহা বলাই বাহুল্য। আমি তাড়াতাড়ি ঘাটের দিকে ছুটিলাম এবং

সমস্ত বিষয় অবগত হইলাম। বহুলোক সমাগম হইয়াছিল; ভিড় ঠেলিয়া কোন প্রকারে দাঁড়াইবার মত একটু স্থান করিয়া লইলাম। যে স্থানে চিতার ব্যবস্থা হইয়াছিল তাহার খুব নিকটেই দাঁড়াইলাম। শেষ কৃত্যগুলি সম্পন্ন হইতেছিল, আমি উহা অত্যন্ত মনোযোগের সহিত দেখিতে লাগিলাম—উহা সাধারণের ক্রিয়া নহে, বিরাট্ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন একজন মহাপুরুষের ক্রিয়া, এইরূপ মনে করিয়া। স্তূপাকার চন্দন-কাষ্ঠরাশির উপরে বাবাজীর দেহ যখন সংরক্ষিত হইল, আমি তখন ঐ দৃশ্য দেখিয়া একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িলাম। ধীরে ধীরে মনকে সংযত করিলাম। চিতা হইতে আট দশ গজ ব্যবধানে দাঁড়াইয়া আছি। তখনও কাষ্ঠরাশিতে কোনও প্রকার অগ্নি সঞ্চার হয় নাই, ধীরে ধীরে ব্যবস্থা হইতেছিল। বাহিরের আলোকে শ্মশান-ভূমি উদ্ভাসিত। হঠাৎ লক্ষ্য করিলাম কাষ্ঠরাশির উপর হইতে এক শুভ্র ধূম্র-কুণ্ডলিনী নির্গত হইয়া উপরের দিকে প্রবাহিত হইতেছে। অগ্নির সংস্পর্শ নাই—অথচ ধূম্র। ইহা দেখিয়া আমি অত্যন্ত বিস্ময় বোধ করিতে লাগিলাম। এই অভাবনীয় দৃশ্যের দিকে তাকাইয়া আছি, কিয়ৎক্ষণ পরেই দেখিলাম ঐ ধূম্ররাশির মধ্য হইতে শুভ্র জ্যোতির্ম্ময় গৈরিক বসন সম্পন্ন ঠিক বাবাজীর মত দেখিতে এক ছায়ামূর্ত্তি বহির্গত হইল, এবং উহা শূন্য পথে গঙ্গার জলের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল এবং কিঞ্চিৎ দূর অগ্রসর হইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। আমি সম্মোহিত চিত্তে ঐ দৃশ্য ও সেই দিব্যমূর্ত্তি দেখিলাম। কিন্তু ভয়ে আমার সমস্ত দেহ যেন অবসন্ন হইয়া

আসিতেছিল, আমি আর সেখানে অধিকক্ষণ থাকিতে পারিলাম না। অনতিবিলম্বেই গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। কেবলই মনে হইতে লাগিল—সিদ্ধপুরুষগণের 'মৃত্যু' আছে কি?

চেতলা (কলিকাতা) বাবাজীর এক শিষ্য বাড়ীতে আমি একবার উপস্থিত হইয়াছিলাম, ইহা আমার এক বাল্য-বন্ধুর স্থানও বটে। সেদিন ছিল বোধ হয় তাঁহার তিরোধান স্মরণার্থে উৎসব, আষাঢ়ের শেষ দিকে। এই উপলক্ষে এক পুষ্করিণী হইতে আমি স্ব-হস্তে কিছু রক্তপদ্ম তুলিয়া বাবাজীর পূজার জন্য লইয়া গিয়াছিলাম। তখন বেলা প্রায় নয়টা হইবে। পদ্মফুল বাবাজীর জন্য লইয়া যাওয়াতে ঐ বাড়ীর সকলে খুব আনন্দিত হইয়াছিলেন। বাবাজীর উৎসব ও পূজাদির ব্যবস্থা যে ঘরের মধ্যে হইয়াছিল, তথায় বন্ধুটির মাতা আমাকে তাঁহার সাথে করিয়া লইয়া যাইলেন; তাঁহার সহিতও কিছু ফুল ছিল। সেখানে গিয়া দেখিলাম, যে বাহির হইতে ঐ ঘরের দরজা বন্ধ। দরজা খুলিয়া ফুলগুলি যাহাতে আমরা পূজার স্থানে রাখিতে পারি, সেইজন্য তিনি দরজা ঠেলিয়া খুলিয়া দিলেন, ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্রই সম্মুখে দেখিলাম যে বাবাজীর একখানি বৃহৎ প্রতিকৃতি রহিয়াছে এবং উহার নিম্নে পূজার সমস্ত দ্রব্যাদি সাজান। ইহার নিকটেই গৈরিক বসন পরিহিত ঠিক বাবাজীর মত এক বৃদ্ধ পুরুষ উপবিষ্ট ও তাঁহার সম্মুখস্থ তাম্র কুণ্ডের উপর দুইটি বাণ লিঙ্গ অবস্থিত এবং তিনি উহার পূজা করিতেছেন। উহাদের মধ্যে একটি উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ, উহা হইতে জোনাকি পোকার মত রশ্মি বাহির হইতেছিল। মনে হইল যেন কাচ বা

স্ফটিকের নির্ম্মিত। এই দৃশ্য দেখিয়া আমার বন্ধুর মাতাঠাকুরাণী চমকাইয়া উঠিলেন এবং 'বাবা, বাবা' বলিয়া আমার হাত ধরিয়া তাড়াতাড়ি আমাকে বাহিরে টানিয়া আনিলেন ও দরজা পুনরায় বাহির হইতে বন্ধ করিয়া দিলেন। আমি এই কথা শুনিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম, কারণ বাবাজী ত' বহুদিন পূর্ব্বে দেহরক্ষা করিয়াছেন। বাবাজীর গাত্রে যেরূপ দিব্য পদ্ম-গন্ধ পাওয়া যাইত ঐ ঘরের মধ্যে ঠিক সেই রকম গন্ধ বাহির হইতেছিল। ঐ ঘরের মধ্যে পূজা করিবার জন্য সমস্ত আয়োজন করিয়া রাখা হইয়াছিল, কিন্তু বাহিরের কোনও ব্যক্তির উহার মধ্যে অবস্থান করিবার কোনও হেতু ছিল না। কয়েকদিন পরে আমার বন্ধুটিকে এই রহস্য সম্বন্ধে পুনরায় জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিয়াছিল, তাহার পিতামাতার গুরুদেব শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস ঐ সময় পূজার ঘরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বাবাজীর এক শিষ্যের নিকট হইতে পরে শুনিয়াছিলাম যে বাবাজীর শিরোমধ্যে ব্রহ্মতালুর নিম্নে একটি শালগ্রামশিলা ও একটি শিবলিঙ্গ অবস্থিত আছে এবং প্রয়োজন হইলে উহা মুখগহ্বর হইতে বাহির করেন। উহাদের পূজান্তে পুনরায় যথাস্থানে রাখিয়া দেন।

১৩৫১ সালের কথা। ইহার প্রায় সাত বৎসর পূর্ব্বে বাবাজী দেহরক্ষা করিয়াছেন। কাশীর 'বিশুদ্ধানন্দ-কানন আশ্রমে' তাঁহার বিগ্রহ দর্শন করিবার জন্য একদিন বেলা প্রায় চারটার সময় গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে যাইয়া একজন আশ্রমবাসীর সহিত পরিচয় হইল। আশ্রমের সকল দ্রষ্টব্য

জিনিস, অতিশয় আগ্রহের সহিত তিনি আমাকে দেখাইলেন। বিজ্ঞান-মন্দির, ঠাকুর-মন্দির, ৺নবমুণ্ডী সিদ্ধাসন প্রভৃতি দেখিলাম। শেষোক্ত স্থানটিতে উপস্থিত হইয়া একটি অপূর্ব্ব শান্ত ভাব মনের মধ্যে আসিল। শুনিতে পাই নাকি বিশ বৎসরের চেষ্টার পরে বাবাজী এই নবমুণ্ডী আসন প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সেখানে একটি বৃহৎ প্রস্তর ফলকে লিখিত আছে—"এখানে বসিয়া পবিত্র ভাবে জপ করিলে সুফল অবশ্যম্ভাবী। অনাচারে ধ্বংস অনিবার্য্য। হোম, বলি ও পূজাদি এইস্থানে সকলেই করিতে পারিবে।" বাবাজী যে স্থানে অবস্থান করিতেন, তাঁহার শয়ন কক্ষ, বসিবার স্থান, এমন কি যে কক্ষে বসিয়া ক্রিয়াদি করিতেন উহাও দর্শন করিবার আমার সৌভাগ্য হইয়াছিল, যাহা আগন্তুকের পক্ষে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। আমি অত্যন্ত আগ্রহের সহিত ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতেছিলাম। যিনি আমাকে এই সকল কক্ষ দেখাইতেছিলেন, তিনি অল্প সময়ের জন্য অন্য স্থানে কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন। আমি পূজার কক্ষে প্রবেশ করিয়া একাকীই দেখিতেছিলাম। ইহার মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র মনের মধ্যে কেমন একটা অদ্ভুত ভাব আসিল। বাবাজীর স্থূল সত্তাটিকে বিশেষ ভাবে যেন অনুভব করিতে লাগিলাম। কক্ষের চারিদিকে নানা দেবদেবীর ছবি লম্বিত রহিয়াছে। মেঝের উপর তাঁহার যোগদণ্ড, পূজাদির জন্য কয়েকটি উপকরণ, বৃহৎ ও মোটা এক আসন রেশম বস্ত্রের দ্বারা আবৃত। উহা এতই পরিষ্কার যেন কেহ পালিস করিয়া রাখিয়া দিয়াছে, কোনও স্থানে

৬

খোঁচখাঁচ নাই। তাঁহার ব্যবহৃত কয়েকখানি গৈরিক বস্ত্রও সযত্নে রক্ষিত। আমি এই সকল নিবিষ্ট চিত্তে দর্শন করিতেছি, এমন সময় হঠাৎ দেখিলাম একখানি মানব-বাহু সম্প্রসারিত ভাবে ঐ ছবিগুলির দিকে সঞ্চালিত হইয়া আমাকে বেশ গম্ভীর ও স্থির কণ্ঠে বলিতেছেন—"দেখ, দেখ, বেশ ভাল করিয়া সবগুলি দেখ।" এই কথাগুলি আমার কর্ণে প্রবেশ করাতে আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম, শূন্য ঘরে কে অমন ভাবে কথা বলিবে ? চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলাম, কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না ; কেবল মাত্র সেই সম্প্রসারিত বাহুখানি। মেঝেতে আসনের উপর দৃষ্টি পড়াতে দেখিলাম যে সেই মসৃণ আসন খানির উপর পদ-যুগলের বিশিষ্ট ছাপ রহিয়াছে, যাহা কয়েক মিনিট পূর্ব্বেও সম্পূর্ণ নিটোল ছিল। এই সব দেখিয়া ভয়ে আমি কাঁপিতে লাগিলাম এবং ঠিক পার্শ্বের ঘরে, যেখানে বাবাজী শয়ন করিতেন, আসিয়া ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িলাম, কিন্তু আমার জ্ঞান লুপ্ত হয় নাই। পার্শ্বের কক্ষ হইতে পূর্ব্বোক্ত সেই আশ্রমবাসী ছুটিয়া আসিলেন, এবং আমার মস্তকে জল সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে একটু সুস্থ হইয়া সকল কথা আমি তাঁহাকে ব্যক্ত করাতে, তিনিও নির্ব্বাক্ হইয়া গেলেন।

বাবাজীর দেহরক্ষার পূর্ব্বে ও পরে তাঁহার অলৌকিক যোগ-শক্তির প্রকাশ অনেকেই দর্শন করিয়াছেন বটে, কিন্তু কেবল মাত্র উহার দ্বারা কোনও সিদ্ধপুরুষের বিরাট্ ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে হৃদয়ঙ্গম করা একেবারেই সম্ভব নহে।

"অদ্যাপি হ সেই লীলা"

সম্পাদক

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৮)

শ্রী.............................

[ক]

বহু জন্মের পুণ্যবলে এ অধম শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেবের আশ্রয় লাভের সুযোগ পায়। আমার পিতা এবং মাতা উভয়েই বহুকাল হইতে শ্রীশ্রীবাবার শ্রীচরণাশ্রিত। আমার জন্ম গ্রহণের পূর্ব্বেই আমার পিতার দীক্ষা হইয়াছিল বলিয়া অতি শৈশবে, অর্থাৎ মাতৃক্রোড় হইতেই, আমি শ্রীশ্রীবাবার দর্শন লাভ করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছিলাম। বাস্তবিক পক্ষে আমি ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতেই তাঁহার কৃপাদৃষ্টি আমার উপর পতিত হয়। শৈশবে এবং বাল্যে মাতাপিতার সহিত শ্রীশ্রীবাবার শ্রীচরণ দর্শন করিবার সৌভাগ্যও আমার বহুবার হইয়াছিল এবং ঐ অবস্থায় ৺কাশীধামের মালদহিয়া আশ্রমে দুই তিন বার মাসাধিক করিয়া অবস্থান করিবার অবসরও পাইয়াছিলাম।

৺কাশী আশ্রমে থাকাকালীন শ্রীশ্রীবাবার বহু অলৌকিক ঘটনা দেখিবার সৌভাগ্য ঘটে ও বহুবার নানা প্রকার দিব্যগন্ধও অনুভব করি। সুগন্ধ লাভ করার কথা বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন বোধ করি না, কারণ এই ব্যাপারটি আমাদের ভিতর অনেকেরই

বিশেষ ভাবে জানা আছে। বাল্যে শ্রীশ্রীবাবা আমাদের গৃহে তিনবার পদধূলি দিয়া আমাদের গৃহকে ধন্য করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে প্রতিবারেই কিছু কিছু ঘটনাও লক্ষ্য করার সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। আমি বহু ঘটনা প্রকাশ করিব না, কারণ বিশেষ কোন কারণে আমি নিজেকে গোপন রাখিতে চাই; সব ঘটনা লিখিলে আত্মপ্রকাশের সম্ভাবনা আছে। আমি কিছুই লিখিতাম না, কিন্তু পরম পূজনীয় আমার দাদা শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের আদেশে কিছুটা লিখিতে বাধ্য হইতেছি।

আমরা দুই ভাই, আমাদের দুইজনেরই দীক্ষার জন্য আমাদের পিতা শ্রীশ্রীবাবার শ্রীচরণে প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। আমার ছোট ভাইয়ের দীক্ষালাভের সৌভাগ্য ঘটে নাই, তবে আমি শ্রীচরণে স্থান পাইয়াছি। দীক্ষালাভের পর শ্রীশ্রীবাবার সঙ্গ লাভের খুব বেশী সুবিধা ঘটে নাই, তাহার অন্যতম কারণ তাঁহার শারীরিক অসুস্থতা ও কিছুদিন পরেই জ্ঞানগঞ্জে গমন। যাহা হউক, ইহার পরও তাঁহার অভাব খুব বেশী বোধ করিবার দুর্ভাগ্য হয় নাই, কারণ তিনি এ অধমকে নানা ভাবে নানা প্রকারে দর্শন, উপদেশ ও বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবার কৃপায়, একবার বাস দুর্ঘটনা ও আর একবার সাইকেল আরোহণ অবস্থায় লরীর সহিত সংঘর্ষ জন্য দুর্ঘটনার হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছি। দ্বিতীয় বারের ব্যাপারে নিজের বোকামীর জন্য যে শ্রীশ্রীবাবা কি ভাবে কষ্টভোগ করিয়াছেন তাহা একমাত্র তিনিই জানেন। প্রথম ঘটনাটি ১৯৫১ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে এবং দ্বিতীয় ঘটনাটি ১৯৪৪ সনের মার্চ্চ-

এপ্রিল মাস লাগাদ ঘটে। উপরোক্ত ঘটনা দুইটিই আমার বাসস্থান হইতে বহুদূরে বঙ্গের বাহিরে মানভূম জিলায় ঘটিয়াছিল।

ইহার পর ১৯৫৩ সনের জানুয়ারী মাসের ঘটনা বলিতেছি। রেলগাড়ীতে চলিতেছিলাম—পথিমধ্যে ইঞ্জিন খারাপ হইয়া গেল। ভাবিতেছিলাম কি করা যায়। গাড়ীতো আর দুই এক ঘণ্টার মধ্যে ছাড়িবে না, অথচ বাড়ী পৌঁছাইতে রাত্রি বেশী দেরী হইলে বাড়ীর সকলেই ভাবিতে থাকিবে এবং নিজের ৺পূজার কাজও সারিতে অনেক বিলম্ব হইবে। ভাবিতে ভাবিতে ঠিক করিলাম, হাঁটিয়াই বাড়ী যাইব, দুই মাইল মাত্র ত পথ। হঠাৎ এক আত্মীয়কে সঙ্গী পাইলাম। অমাবস্যা রাত্রি—রেল লাইনের উপর দিয়া হাঁটিতেছি পাথরের ঠোক্কর খাইতে খাইতে। কিছুদূর এগিয়ে দেখি একটি ছোট ব্রীজ। মহামুস্কিল—এই রাত্রির অন্ধকারে কি ভাবে ব্রীজ পার হইব। যদি পা সামান্য এদিক্ ওদিক্ হয় তাহা হইলে অন্ততঃ বিশ বাইশ ফুট নিম্নে পড়িতে হইবে, কারণ ব্রীজের উপর কেবল slipper পাতা আছে, নিম্নে ফাঁকা। এই স্থানটি লোকালয়ের বাহিরে trenching ground এর নিকট। পুত্র মহাবিপদে পড়িয়াছে দেখিয়া পরম করুণাময় বাবা আর স্থির থাকিতে না পারিয়া চার পাঁচ বৎসর বয়স বালকের রূপ ধরিয়া নগ্ন অবস্থায় হাতে হ্যারিকেন লণ্ঠন লইয়া হঠাৎ উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "বাবু, কোথায় যাবি রে? যেতে ভয় করছে অন্ধকারে লাইনের উপর দিয়ে? আয়, আমি আলো দেখাচ্ছি। তুই চলে আয়, ভয় করিস্ না।" যখন ব্রীজ পার হইতেছি তখন

উনি আমাদের সামনে আলো দেখাইয়া এগিয়ে দিলেন, তারপর পিছু নিলেন। এই অবস্থায় এত বেশী মোহাচ্ছন্ন করিয়া দিলেন যে একবারও ভাবিলাম না যে কে এই দরদী নগ্ন বালক! কাঁর এত বেশী দরদ যে এই অন্ধকার রাত্রে এ অধমকে পথ আগাইয়া দিতে আসিলেন? এই লোকালয়ের বাহিরে কোথা হইতে আসিলেন? আমার পূর্ব্বোক্ত ঐ আত্মীয়ের সহিত কথা বলিতে বলিতে কিছুদূর অগ্রসর হইতেছি, হঠাৎ দেখি পিছনে আলো নাই এবং বালকও নাই। তখন ঐ সম্বন্ধে কোন চিন্তাই করিলাম না। বাড়ী আসিবার পর বিশ্রাম করিয়া হাত মুখ ধুইবার পর যখন আহ্নিক ঘরে আসন পাতিয়া ধূপ জ্বালিয়া বসিতে যাইতেছি হঠাৎ তখন পরম করুণাময় বাবার ছবির দিকে তাকাইতেই যেন উহাতে কিছু মুচকী হাসার ভাব লক্ষ্য করিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গেই রেল লাইনের বিপদ ও ছোট বালকটির কথা মনে পড়িতে লাগিল। তখন মনে বড় দুঃখ হইতে লাগিল যে এত কাছে পাইয়াও একবারের মত তাঁহাকে ভাল ভাবে দেখিতে পাইলাম না। এই ব্যাপারের জন্য দুই তিনদিন বেশ মন খারাপ ছিল। তারপর আবার শ্রীশ্রীবাবা সব ঠিক করিয়া দিলেন। আমার জীবনে আরও এত ঘটনা আছে যে তাহা শুনিলে সকলেই আশ্চর্য্য হইবেন, কিন্তু তাহা আমি প্রকাশ করিব না, প্রকাশ করিলে আর আত্মগোপন থাকিবে না। কারণ ঐ ঘটনাগুলির মধ্যে অনেক-গুলিই আমার অন্তরঙ্গ দাদারা কিছু কিছু জানেন। আমি অধম হইলেও সমস্ত দিক্ দিয়াই শ্রীশ্রীবাবার একজন অতি ভাগ্যবান্ শিষ্য; সুখ, শান্তি, স্বাস্থ্য, অর্থশক্তি তিনি প্রচুর দিয়াছেন,

কোন কিছুরই অভাব রাখেন নাই। আবার প্রয়োজন বোধে দেখা দিতেও কুণ্ঠা বোধ করেন না, কাজেই আমি খুব খুসী আছি, কোন কিছুরই অভাব আমার নাই। নিজেকে আরও খুসী এবং ধন্য মনে করি এই জন্য যে যখন শ্রীশ্রীবাবা প্রয়োজন মনে করেন এই শরীরকে দিয়া কাজ নিয়া থাকেন।

আজ একটি ঘটনা লিখিতেছি। ঘটনার দিনটি অতি পুণ্যবান্ ও স্মরণীয় দিন,—২৯শে ফাল্গুন সন ১৩৬২। এই দিনটি আরও বেশী স্মরণীয় এই জন্য যে ঐটি শ্রীশ্রীবাবার শততম জন্মোৎসবের দিন। শ্রীশ্রীবাবার জন্মোৎসব তাঁহার জন্মভূমি বণ্ডুল গ্রামেই নিয়মিতভাবে সম্পন্ন হয়। ৺কাশী আশ্রমে সামান্য কিছু উৎসব ও কুমারী মাতাদের সেবার ব্যবস্থা থাকে, মূল উৎসব বণ্ডুলেই হয়। এবার ৺শিবরাত্রি ও জন্মোৎসব দুই দিনের ব্যবধানে হওয়ার দরুণ কোন কোন গুরুভাই-এর নিকট হইতে আবেদন আসিয়াছিল যে দুই উৎসবই ৺কাশীতে হইলেই ভাল হয়। যাহা হউক, তাহা হওয়া সম্ভবপর হয় নাই। যথারীতি ভাবে বণ্ডুলেই শ্রীশ্রীবাবার জন্মোৎসব হইয়া থাকে। ৺কাশীবাসী গুরুভাইদের মনে অবশ্য কিছু কষ্ট হইয়াছিল, কারণ এইবার শতবর্ষের উৎসব অথচ শ্রীশ্রীবাবার এত বেশী প্রিয় আশ্রমে কিছু হইবে না। যাহা হউক, শ্রীশ্রীবাবা আর ত চুপ করিয়া থাকিতে পারেন না,—যখন ছেলেদের মনে সত্যিকারের দুঃখ হইয়াছে দেখিলেন অমনিই সব ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। শুনিলাম যে এক গুরুভাই একশত আট সবস্ত্র কুমারী করাইবেন ঐ দিনেই। আমাদের উৎসব মানেই কুমারী মাতাদের সেবা করান, কাজেই

যদি একশত আট সবস্ত্র কুমারী হয় তাহার চেয়ে আর বেশী কি আছে ? তারপর শুনিলাম যে ঐ দিনই শ্রীশ্রীবাবার তৈল-চিত্রের (প্রমাণ সাইজ) উন্মোচন হইবে এবং বেদপাঠও হইবে । যিনি বেদপাঠ করিবেন তিনি শ্রীশ্রীবাবার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার দিনও বেদপাঠ করিয়াছিলেন। কাজেই সব দিক্ দিয়াই যোগাযোগ ভালই হইল।

শনিবার দিন ৺শিবরাত্রি উৎসব হইয়া, রবিবার দিন কুমারী ভোজনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। মধ্যে সোমবার, ঐ দিন সকলেই ব্যস্ত ছিলেন পরদিনের শুভ উৎসবের জন্য। এ কয়দিনই অর্থাৎ শুক্রবার দিন হইতেই যেন আশ্রমের চেহারা বদলিয়া গিয়াছিল। আশ্রমের গাছপালা, ফুল, লোকজন সকলেই যেন খুব খুসী। সকলেই যেন হাসিতেছে, আমাদের পদ দাকে দেখিতেছি সর্ব্বদা সে প্রাণ খুলিয়া চেঁচাইয়া গান গাহিতেছিল আর আনন্দে নাচিতেছিল। আমারও মনে কম আনন্দ হয় নাই গুরুভাই ও ভক্তেরা, যাঁহারা কর্ম্মকর্ত্তা হইয়াছেন তাঁহারাও, যথেষ্ট পরিশ্রম করিতেছেন, যাহাতে সমস্ত কার্য্য ভালরূপে সম্পন্ন হইয়া যায়। ক্ষেত্রদাদা ৺শিবরাত্রির পূর্ব্বেই আসিয়াছিলেন, তিনিও উৎসব লইয়া খুবই ব্যস্ত। ক্ষেত্রদাদা শ্রীশ্রীবাবার একজন অতি পুরাতন ও বিশিষ্ট শিষ্য। ৺কাশী আশ্রমে কেহ কেহ ভালবাসিয়া ইঁহার নাম ধুমকেতু দিয়াছিলেন, কারণ ইনি বৎসরে বহুবার আসেন ও কিছুক্ষণ অবস্থান করিয়া চলিয়া যান। কিন্তু এবারে তিনি স্থায়ী হইলেন। সোমবার দিন রাত্রিতে শুনিলাম যে শিষ্যরা ও ভক্তরা শ্রীশ্রীবাবার মন্দির সারারাত্র

ধরিয়া সাজাইয়াছেন, এবং ক্ষেত্রদাদা কুমারী মাতাদের সেবার জন্য নিজ হস্তে কোমরে গামছা বাঁধিয়া এই অতি বৃদ্ধ বয়সে সহাস্য বদনে রন্ধন করিয়াছেন রাত্র তিনটা হইতে। ক্ষেত্রদাদাই পূর্ব্বে এই কার্য্য মাথা পাতিয়া স্বয়ং করাইতেন, কাজেই আজকের দিনে উহা তাঁহাকে নিজে হাতে করিতে হইল। একেই ত বলে মজা ও ভাগ্য। মধ্য রাত্রিতে কিছু ঝড়বৃষ্টি হইয়াছিল। ভোরে মেঘ করিয়াছিল। এমন সময় দেখিলাম শচীন দত্ত দাদা ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, শিষ্য, শিষ্যা ও ভক্তদের লইয়া প্রাণ খুলিয়া প্রভাত ফেরীর গান সুরু করিয়াছেন। যেমন গানের ভাব, তেমনিই রচনা আর সাথে সাথে প্রাণ খুলিয়া ডাক। সঙ্গে কাঁসর, ঘণ্টা, শঙ্খধ্বনি কি সুন্দর যে লাগিতেছিল তাহা কি বলিব! যদি কবি হইতাম কত কি না লিখিতাম। যাহা হউক, এই সব দেখিয়া খুবই খুসী হইলাম আর আনন্দে কাঁদিতে লাগিলাম। গান গাহিতে গিয়াছিলাম, গলা হইতে আওয়াজ বাহির হইল না, শুধু চোখের জল পড়িতে লাগিল। ভাবিলাম এই ভাল।

প্রভাত ফেরীর পর দেখিতে পাইলাম সকলেই নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত। তারপর কিছুক্ষণ পরে গোপীনাথ দাদা আসিলেন। আসিয়া সব দেখিলেন ঠিক মত ব্যবস্থা হইয়াছে কিনা, কারণ সমস্ত ভারই ত তাঁহার উপর ছিল। দেখিয়া শুনিয়া ব্যবস্থা করিলেন যে শ্রীশ্রীবাবার তৈলচিত্র উন্মোচন হইবে বিজ্ঞান-মন্দিরের হল ঘরে এবং তারপর শ্রীশ্রীবাবার মন্দিরে বেদপাঠ সুরু হইবে। ক্ষেত্রদাদার ডাক পড়িল চিত্র উন্মোচন করিবার জন্য। এই সময়ের জন্যও বেদপাঠেরও ব্যবস্থা ছিল। সকলেই

উৎসুক চিত্র দেখিবার জন্য। বহু শিষ্যশিষ্যা, ভক্ত, বালকবালিকা উপস্থিত। ক্ষেত্রদাদা আসিতে দেরী করিতেছিলেন, কারণ এক হাণ্ডা পলান্ন উনান হইতে না নামাইয়া আসিতে পারিতেছিলেন না।

কিছুক্ষণ পরে তিনি সহাস্যবদন লইয়া ছুটিতে ছুটিতে বালকের ন্যায় আসিয়া হাজীর হইলেন এবং গোপীনাথ দাদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি করিতে হইবে?" গোপীনাথ দাদা বলিবার পর ক্ষেত্রদাদা কোমরের গামছা গলায় জড়াইয়া ভাবে ভক্তিতে গদগদ হইয়া জোড়হস্তে সহাস্যবদন নিয়া প্রথমে চিত্রের সম্মুখে প্রণাম করিলেন, তারপর ধীরে ধীরে চিত্রের দিকে অগ্রসর হইলেন। সমগ্র ঘরটি তখন এক অপূর্ব্ব আনন্দে ভরপুর। তারপর 'জয়গুরু' বলিয়া চিত্রটি উন্মোচন করিলেন এবং ঐ সঙ্গেই বেদপাঠ সুরু হইল। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য, সে দৃশ্য যিনি দেখেন নাই তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিবার মত ক্ষমতা কাহারও আছে বলিয়া আমার ধারণা হয় না। চিত্রটি দেখিলে মনে হয় না যে চিত্র দেখিতেছি, মনে হয় শ্রীশ্রীবাবাই সশরীরে বসিয়া আছেন। চিত্রটি দেখিতেছি কি শ্রীশ্রীবাবাকেই দেখিতেছি ঔৎসুক্য ভরে তাহা জানি নাই। কিছুক্ষণ পরেই দেখি সত্যই শ্রীশ্রীবাবাই বসিয়া আছেন। প্রথমে দেখিতে পাইলাম তাঁহার চক্ষু দুইটি ঝপ্‌ঝপ্‌ করিয়া পাতা ফেলিতেছে। তাহার পর দেখিলাম হাসিতেছেন, তাহার পর সুরু করিলেন লীলা। সে যে কি লীলা তাহা কি লিখিব? অনেকেই হয়ত ধারণা করিতে পারেন যে এ সব আবার হয় না কি। কিন্তু আশা করি

আমাদের মধ্যে ঐ ভাব হয়ত কাহারও হইবে না, কারণ শ্রীশ্রীবাবার লীলা অনেকেই অনেক ভাবে দেখিয়া থাকেন। উহা বাস্তবের পক্ষে সত্য না হইলেও আমাদের পক্ষে পরম সত্য। ইজি চেয়ারে বসান চিত্র, কিন্তু আমি দেখিলাম উনি দাঁড়াইয়া আছেন। তারপর দেখিলাম যোগাসনে বসিয়া আছেন।

ইহার পর স্থুরু হইল চেহারার পরিবর্ত্তন। একবার দেখি অল্প বয়সের চেহারা, তাহার পর দেখি উহার পরের অবস্থা, এইভাবে পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। কতকগুলি অবস্থা ছবিতে ছাড়া দেখিবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই, কাজেই শ্রীশ্রীবাবা আজ এই শুভদিনে তাহাও দেখাইয়া দিলেন—কোন অভাবই আমার রাখিলেন না। কত রকমই দেখিতেছি। ইহার পর হঠাৎ দেখি শ্রীশ্রীবাবার মুখ এবং ঐ সাথে তুইপার্শ্বে আরও তুইটি মুখ অর্থাৎ ত্রিমুখ। ব্যাপারটি কি, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তারপর আবার দেগি শ্রীশ্রীবাবা একলাই হাসিতেছেন, তুটি মুখ আর নাই। তার পর দেখি প্রাতঃকালীন সূর্য্যের ন্যায় রূপ লইয়া শ্রীশ্রীবাবার শরীরের সঙ্গে আসিয়া মিশিলেন আমাদের পরম পূজ্যপাদ জ্যাঠা গুরুদেব শ্রীশ্রীভৃগুরাম পরমহংস। সে অপূর্ব্ব দৃশ্য। একবার দেখি শ্রীশ্রীবাবাকে, একবার দেখি শ্রীশ্রীজ্যাঠাগুরুদেবকে। আবার দেখি তুজনেই এক হইয়া গিয়াছেন। তখন মনে মনে স্মরণ করিলাম শ্রীশ্রীজ্যাঠাগুরুদেবের উক্তিটি "তোমাতে যখন আমি প্রবেশ করি তখন তুমি আমি, যখন ছাড়ি তখন তুমি তুমি।" আবার শ্রীশ্রীবাবার চেহারার পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। একবার

দেখিলাম গাত্রে কোন আবরণ নাই, কেবল কটিদেশে মাত্র বাঘছাল, দাঁড়িয়ে আছেন, মুখে গোঁফদাড়ি নাই, রং কিছুটা তামাটে। তারপর দেখি দাঁড়াইয়া আছেন সম্মুখে, যেন অগ্নি জ্বলিতেছে এবং অগ্নিশিখা শ্রীশ্রীবাবার মস্তকোপরি উঠিতেছে। আবার সঙ্গে সঙ্গে দেখি তাঁহারই চতুঃপার্শ্বে অগ্নি জ্বলিতেছে এবং তাহার মধ্যে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া হাসিতেছেন। ইহার পর শ্রীশ্রীবাবার নানা রকমের মুখ পরিবর্ত্তন দেখিলাম, মুখের পরিবর্ত্তনের মধ্যে মধ্যে অপর কিছু কিছু মুখ দেখিলাম তাহা কাহার তাহা আমি জানি না। এইভাবে প্রায় দশ পনের মিনিটের মধ্যে কত সুন্দর সুন্দর রূপই যে দেখিয়াছি তার কিয়দংশ মাত্র বর্ণনা দিলাম। কারণ যা প্রত্যক্ষ করিয়াছি তার সব বর্ণনা আমার মত ব্যক্তির পক্ষে ভাষায় দেওয়া সম্ভবপর নয়। শ্রীশ্রীবাবার ত্রিমুখ যখন দেখি তাহাতে মনে হয় মধ্যে শ্রীশ্রীবাবা, দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রীশ্রীজ্যাঠাগুরুদেব এবং বাম পার্শ্বে কে তাহা বিশেষ ভাবে অনুমান করিতে না পারিলেও মনে হয় শ্রীশ্রী৺নারায়ণের মুখ।* মুখে সব বর্ণনা করা বরং সম্ভব কিন্তু তাহা লেখা সম্ভব নয় এবং কিছু কিছু গোপনীয় জিনিসও আছে।

---

* এই ত্রিমুখ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের বলিয়া মনে হয় যাহা অনসূয়া-গর্ভসম্ভূত আদিগুরু ভগবান্ দত্তাত্রেয়দেবের স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। জ্যাঠা গুরুদেব শিবরূপী, নারায়ণ বিষ্ণুরূপী এবং মধ্যে শ্রীগুরুদেব ব্রহ্মরূপী। গিরনারের যোগিগণ ভগবান্ দত্তাত্রেয়ের সহিত সংস্পৃষ্ট। শ্রীগুরুদেবের সহিত গিরনারের ধারার সম্বন্ধ ছিল শুনিয়াছি। পক্ষান্তরে ভগবান্ দত্তাত্রেয়ের সঙ্গে জ্ঞানগঞ্জের সম্বন্ধের কথাও জানিতে পাওয়া গিয়াছে —সম্পাদক।

এইরূপ দৃশ্য আমি ইহার অল্প কয়েকদিন পরে গৃহে আবার দেখিয়াছিলাম। একদিন ঘরে বসিয়া আছি, আনমনে কিছু ভাবিতেছি, শ্রীশ্রীবাবার ফটো ঘরে আছে ছোট একখানি, কিন্তু সেদিকে আমার লক্ষ্য ছিল না। ভাবিতেছি গোপীনাথ দাদা দুইবার চিঠি দিয়াছেন তাগাদা দিয়া এই বিষয়টি শীঘ্র লিখিয়া পাঠাইবার জন্য পাছে দেরী হইলে সব ভুলিয়া যাই। কিন্তু কি ভাবে লিখিব এবং আদৌ লিখিব কি-না তাই ভাবিতেছি। তখনই আবার চোখের সামনে কিছু কিছু ঐ সব লীলা সুরু হইল। সুতরাং শ্রীশ্রীবাবার শ্রীচরণে প্রণাম করিয়া এই ব্যাপারটি লিখিলাম। লিখিবার খুব বেশী ইচ্ছা আমার ছিল না, কিন্তু দাদার আদেশে লিখিলাম। পাঠকদের কাছে নিবেদন এই, কেহ শ্রীশ্রীবাবার সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ করিবেন না। শ্রীশ্রীবাবা প্রতি মুহূর্ত্তেই নিজ খেয়াল মতে নানান ভাবে নানান লীলা করিতেছেন, যার ভাগ্যে আছে তিনি দেখেন। এ অধমের প্রতি হয়ত কোন কারণে খুসী হইয়াছেন তাই কিছুটা লীলা দেখাইলেন। আমি শ্রীশ্রীবাবার অধম সন্তান হইলেও তিনি আমাকে বিশেষ ভাগ্যবান্ করিয়াছেন নানান বিষয়ে এবং সেইজন্যই প্রায়ই ইচ্ছাবশে নানান দিক্ দিয়া কৃপা করেন। সকল বিষয় সকল সময় প্রকাশ করা যায় না, তাই কিছু কিছু গোপন রহিল।

আজ সফল হল রে দিনটি মোদের, ধন্য হল রে প্রাণ,
উদার স্বপনে বহিছে মলয়া, পাপিয়া তুলিছে তান,
হেরিয়া রাতুল চরণ দুখানি হৃদয়ে পরমানন্দ,
জয় গুরুদেব জয় ভগবান্ জয় শ্রীবিশুদ্ধানন্দ।

(৯)

শ্রীঅন্নদা শঙ্কর ভট্টাচার্য্য

নাম তাহার অজয় শঙ্কর, ডাক নাম বলাই। বয়স পাঁচ বৎসর। প্রায়ই দেখি আমি আহ্নিকের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেই বলাই ঘরে কপাট দিয়া আমার আহ্নিকের স্থানটিতে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। একদিন ঐ অবস্থার পর ঘর হইতে বাহিরে আসিলে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বলাই, তুমি ওখানে বসিয়া কি কর?" সে গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, 'আহ্নিক'। তাহার আহ্নিকের সময় কেহ ঘরে গেলে কিংবা বাহিরে কেহ গোলমাল করিলে সে খুব রাগ করিত এবং আমার নিকট নালিশ করিত। আমি ঐ সময় বলাইকে বিরক্ত করিতে সকলকে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলাম।

এই সময় আমি বাত ও চক্ষুরোগে আক্রান্ত হইয়াছিলাম। ওদিকে নোয়াখালীর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ধীরে ধীরে বাংলার পল্লীসমূহে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। ১৩৫২ সনের কার্ত্তিক মাসে কলিকাতার অবস্থা অনেকটা শান্ত। আমি চিকিৎসার উদ্দেশ্যে সপরিবারে কলিকাতায় আসিলাম। বহু চিকিৎসার পর চক্ষু-বিশারদগণ আমার বাম চক্ষু অচিরে এবং দক্ষিণ চক্ষুও এক বৎসর মধ্যে নষ্ট হইবে বলিয়া হতাশ হইলেন। কিছুকাল মধ্যেই কলিকাতায় আবার দাঙ্গা আরম্ভ হইল। রাস্তা ঘাটে বাহির হওয়া আদৌ নিরাপদ্ নহে—চিকিৎসা বন্ধ হইয়া গেল। দেশে ফিরিয়া যাওয়াও যুক্তিযুক্ত মনে হইল না—দেশ-বিভাগ অনিবার্য্য মনে হইল। কোচবিহারে স্থায়িভাবে বসবাস করিবার

উদ্দেশ্যে তথায় চলিয়া গেলাম ১৩৫৩ সনের ৯ই বৈশাখ। কিছুদিন এক আত্মীয়ের বাসায় থাকিয়া পরে উহা হইতে একটু দূরে এক ভাড়াটিয়া বাসার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

এই কয় মাস নানা প্রকার বিপর্য্যয়ে যখন যেখানে পারিতাম কোনও প্রকারে আহ্নিক সারিয়া লইতাম। চক্ষু পীড়িত হওয়া অবধি ক্রিয়া বন্ধই ছিল। রোগ-যন্ত্রণায় অস্থির হইলে স্ত্রী ও মেয়েরা মাথা ও শরীর টিপিয়া দিত। বলাইও অবকাশ মত আসিয়া চোখে হাত বুলাইয়া দিত এবং মাঝে মাঝে আহ্নিকের জন্য তাগিদ দিত, "বাবা, আহ্নিক ত' কর না?"—বলিতাম, "এইবার করবো।" ডাক্তার চক্ষু সম্বন্ধে নিরাশ করা সত্ত্বেও আমি জানি না কেন অন্ধ হইয়া থাকিতে হইবে বিশ্বাস করিতে পারিতাম না। কখনও কখনও বলিতাম, "বলাই, ডাক্তার বলেছে আমি এক বছরে অন্ধ হয়ে যাবো, তুই চোখে কিছুই দেখতে পাবো না।" বলাই হাসিয়া বলিত, "ধুর্র্, ওরা কিছু জানে না। এক বছর না কচু।"। বামচক্ষু এক বৎসর হইল ক্ষীণদৃষ্টি হইয়াছে মাত্র। এক যুগ অতীত হইয়াছে, কিন্তু আজও আমি অন্ধ হই নাই।

বৈশাখ মাসের শেষে আমরা ভাড়াটিয়া বাসায় গেলাম। বলাই এই সময় হইতে প্রতিদিন দুই বেলা নিয়মিতভাবে আহ্নিক করিতে সুরু করিল। কোন কোন দিন আহ্নিকে সময় বেশী লাগিত। কখনও বলাইর আর্দ্রকণ্ঠের সুর বাহিরে ভাসিয়া আসিত। কোন কোন দিন দেখিতাম শুষ্ক অশ্রুচিহ্ন তখনও গণ্ডে রহিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিতাম, "বলাই, আহ্নিকে বসিয়া

গান কর কি?" বলিত, "হ্যাঁ, গানই ভাল লাগে।" "কি গান কর?" হাসিয়া বলিল, "ধ্যেৎ, যা মনে আসে তাই।"

একদিন বলাই বলিল, "বাবা, ঠাকুরের ফটোটা তো ছবি? ছবির চোখে আগুন, আগুনে ছবি পোড়ে না, ও' ঠাণ্ডা আগুন—তাই পোড়ে না, না?"

আর একদিন "বাবা, আমার চোখ থেকে বেড়িয়ে আগুনটা ঠাকুরের চোখে যায়, আবার তাঁর চোখ থেকে ফিরে আমার চোখে আসে। তারপর আগুনের ভিতর থেকে ঠাকুর আমার দিকে চেয়ে চেয়ে হাসে। ভারী দুষ্টু ঠাকুর, কথা বলে না। আমি ধর্‌তে গেলে কোথায় যেন পালিয়ে যায়। চেয়ে দেখি শুধু ছবি—আর হাসে না।"

একদিন আমার তৃতীয়া কন্যা অঞ্জলি চতুর্থী নিমুকে বলিল "তুই আজ ঠাকুরদাকে প্রণাম করেছিস্"? বলাই বলিল, "ঠাকুরদা কেরে?" "ঐ যে ও ঘরে বাবা যাঁর কাছে বসে আহ্নিক করে"। বলাই উত্তর দিল, "দূর বোকা, ঠাকুরদাদা নয়—উনি বাবা, বাবারও বাবা, আমাদেরও বাবা, উনি সকলেরই বাবা।" আমি পাশেই ছিলাম। অঞ্জলি বয়সে বড়, সে বলাইয়ের কথা ভুল মনে করিয়া একটু বিজ্ঞতার হাসি হাসিয়া আমার দিকে তাকাইতেই আমি বলিলাম, "বলাই ঠিকই বলেছে—উনি আমার বাবা, তোমাদের বাবা, দুনিয়ার সকলেরই বাবা – আজ থেকে তোমরা ওঁকে বাবা গুরুদেব বলেই ডাক্‌বে।"

রাত্রি তখন দশটা এগারটা হইবে। কি একটি সওদার জরুরী প্রয়োজন। অঞ্জলিকে বলিলাম, "দোকান থেকে কিনিয়া

নিয়ে এস না।" অঞ্জলি মুখ কাচুমাচু করিয়া বলিল, "বড় অন্ধকার, ভয় করে যে?" "নিমুকে সঙ্গে নিয়ে লণ্ঠনটি নিয়ে যাও।" অঞ্জলি তবুও ইতস্ততঃ করিতেছিল। বলাই বলিল, "দূর, ভয় কিরে, আমাকে পয়সা দাও, আমি নিয়ে আসি"। বলিয়াই সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং আমার হাত হইতে পয়সা লইয়া দ্রুত চলিয়া গেল। আমি "বলাই, লণ্ঠনটি নিয়ে যা, বড় অন্ধকার" বলিয়া দরজার বাহিরে যাইতেই বলাইয়ের গানের সুর ভাসিয়া আসিল, বুঝিলাম উহা তাহার প্রার্থনাকালীন গানের সুর। জিনিষ লইয়া বলাই ফিরিয়া আসিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, "লণ্ঠনটি নিয়ে গেলি না কেন?" "কেন, অন্ধকারে ত বেশ দেখা যায়।" "একা গেলি, তোর ভয় নাই?" "না, ভয় কি, আমি ত একা যাই না; গান গাহিলেই বাবা যে আমার সাথে সাথে, হয় আগে নয় পিছনে, থাকেন" বলাই পিছন হইতে আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কানে কানে বলিল। আমি বিস্মিত হইয়া গেলাম।

সেদিন সকাল সাড়ে আটটা নয়টা। আমি বৈষয়িক কতকগুলি কাগজ পত্র দেখিতেছিলাম। বলাই ভয়ানক রাগতঃ ভাবে আসিয়া নালিশ জানাইল, "বাবা, দেখতো ঠাকুর কি দুষ্টু, আমাকে প্রস্রাব করিতে দেয় না।" আমি বলিলাম, "কেন, কি হয়েছে?" "যেখানেই আমি প্রস্রাব করতে যাই, ঠাকুর এসে সাম্‌নে দাঁড়ায়, সর্‌তে বল্লেও কিছুতেই সরে যায় না, আবার হাসে।" নির্ব্বাক্ হইয়া ক্ষণেক চাহিয়া থাকিয়া বলিলাম, "তুমি প্রস্রাব ক'রে দাও, গায়ে লাগে লাগুক না।"

"হ্যাঁ, আবার পাপ দেবে যে।" "না, না, পাপ দেবেন না, তুমি তাঁর গায়ে প্রস্রাব কর্‌তে পার্ব্বেই না, তিনি সরে যাবেন। যাও, প্রস্রাব করগে।" "সর্‌বে না ছাতু, দাঁড়াও, এবার না সর্‌লে ঠিক দেব গায়ে প্রস্রাব ক'রে" বলিয়া হন্ হন্ করিয়া প্রস্রাবের স্থানে চলিয়া গিয়া হাততালি দিতে দিতে প্রস্রাব করিয়া আমার নিকট আসিল, মুখে হাসি। বলিলাম, "কি রে, প্রস্রাব হলো ?" "হ্যাঁ, এমন দুষ্টু, সরে যাও নইলে গায়ে দিব প্রস্রাব ক'রে ব'লে যেই প্রস্রাব করেছি, বাবা অমনি দূরে দাঁড়িয়ে হাততালি দিতে লাগিল, আমিও তাই হাততালি দিলাম। তোমার কাছে যে ব'লে দিয়েছি, নইলে সরে যেত না। বড্ড দুষ্টু, কিন্তু তোমাকে দেখে ভয় পায় বড়।" ভাবিলাম, "ভয়ই পায় বটে রে। ঠাকুর এত খেলাও খেল্‌তে পার তুমি।"

এই সময় বলাই আমার নিকট শয়ন করিত। প্রতিদিন রাত্রিতে শয়ন করিয়াই বলাই, ঠাকুর-দেবতার কথা শুনিতে চাহিত। অন্য ঠাকুর দেবতার প্রসঙ্গ অপেক্ষা বলাই বাবার কথা শুনিতেই বেশী আগ্রহ প্রকাশ করিত। অনন্ত লীলা ঠাকুরের, আমি তার কতটুকুই বা জানি। কিন্তু বলাইর আগ্রহের শেষ নাই। প্রথম প্রথম নিজে যাহা দেখিয়াছি, তারপর যাহা শুনিয়াছি, সবই বলিলাম। শেষে ঠাকুরের লীলা-রহস্য পড়িয়া ভাগ্যবান্ গুরুভ্রাতাদের লিখিত ঘটনাগুলি বলিলাম। আমার ভাণ্ড শেষ, কিন্তু বলাইর আগ্রহের নিবৃত্তি নাই। "আরও বল, আবার ঐ গল্পটা (পূর্ব্ব কথিত) বল"—এমনি ভাবে আমাকে অতিষ্ঠ করিত। বাবার কথা বলিতে বলিতে আমি ঘুমাইয়া

পড়িতাম। বলাই জাগিয়াই থাকিত এবং পরদিন আমাকে অনুযোগ করিত। আমাদের পাড়ায় কোথাও রামায়ণ গান কিংবা কীর্ত্তন হইলে, আমি কার্য্যানুরোধে যাইতে না পারিলেও বলাই তথায় যাইবেই এবং বৃষ্টি বাদল, শীত, যত রাত্রিই হউক শেষ পর্য্যন্ত সেখানে বলাইর থাকা চাই-ই। অনিদ্রিত অবস্থায় সব শুনিবে এবং পরদিন রাত্রে আমার নিকট যতদূর সম্ভব বলিবে। বয়স্ক ব্যক্তিরা সাধু মহাপুরুষদের সম্বন্ধে কিংবা ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায় সম্বন্ধে নানা প্রকার আলোচনা করিতেছেন বলাই এক পার্শ্বে বসিয়া সর্ব্বেন্দ্রিয় দিয়া যেন তাহা শুনিতেছে।

তখন কোচবিহারে 'ভাটিয়া খেদা' আন্দোলন পূর্ণোদ্যমে চলিয়াছে। যে সমস্ত বাস্তুত্যাগী বসবাসের জন্য আসিয়াছেন তাঁহারা যাহাতে কোচবিহারে থাকিতে না পারেন তজ্জন্য কোচবিহারের কতিপয় অধিবাসী মিলিত হইয়া একটি প্রবল দল সংগঠন করিয়া লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের অনুরূপ সক্রিয় পন্থা অবলম্বনে উন্মুখ। কোচবিহার তখন মহারাজার শাসনাধীনে। মন্ত্রিসভার অধিকাংশ সভ্য প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যভাবে এই দলকে সাহায্য করিতেছিলেন। আমরা স্তূপীকৃত বারুদরাশির উপরে দণ্ডায়মান। যে কোন মুহূর্ত্তে দাবাগ্নি প্রজ্বলিত হইতে পারে। বাপ পিতামহের চৌদ্দ পুরুষের ভিটা, আত্মীয়, স্বজন, সমাজ, প্রতিবেশী, পরিবেশ—সমস্ত হইতে বিচ্যুত হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী হিন্দুরাজ্য কোচবিহারে নূতন করিয়া জীবন যাত্রা আরম্ভ করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা লইয়া সর্ব্বহারাগণ যখন কোচবিহারে আসিল তখন দেখিতে পাইল প্রবলতর বেগে এবং নূতনতর মূর্ত্তিতে

রুদ্ররূপে দুর্ভাগ্য তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত। এখানে একা মুসলমান নয়, হিন্দু মুসলমান মিলিতভাবে এই ক্ষুৎপিপাসাক্লিষ্ট, কঙ্কালসার, আশ্রয়প্রার্থী মানুষগুলিকে অপসারিত করিতে বদ্ধ-পরিকর। দিন নাই, রাত্রি নাই, দলে দলে দেশী' লোকেরা লাঠি, সড়কি প্রভৃতি হাতিয়ার হস্তে, কখনও পায়ে হাঁটিয়া, কখনও বা মোটর ট্রাকে "কোচবিহারীর কোচবিহার", "ভাটিয়ার স্থান নাই", "ভাটিয়াকে এ দেশ ছাড়্‌তে হবে" ইত্যাদি শ্লোগানে আকাশ বাতাস কাঁপাইয়া তুলিত। বাস্তুত্যাগীরা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এবং কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ়। কয়েকটি বন্ধুর সাহায্যে আমি ধীরে ধীরে সহরের বিভিন্ন অঞ্চলের এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামের বাস্তুত্যাগীদের লইয়া একটি কমিটি সংগঠন করিতেছিলাম। আমাকে উহার সম্পাদক করা হইল, কিন্তু 'রাজ সরকার' এই কমিটীকে অনুমোদন দিলেন না। সুতরাং রাজরোষও আমার উপর নিপতিত হইল।

ইত্যবসরে একদিন সন্ধ্যার পর বাসায় বসিয়া আছি, একটি অচেনা বালক আসিয়া সংবাদ দিল "আপনাদের বাসার কানু (আমার জ্যেষ্ঠপুত্র) হরিসভার নিকটে সাইকেল চাপা দিয়াছে, দেশী লোকেরা সাইকেল কাড়িয়া লইয়া বেড় দিয়াছে।" সংবাদ শুনিয়াই আমি দ্রুত হরিসভার দিকে ছুটিলাম। আমার স্ত্রী ও মেয়েরা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে আমার পিছনে পিছনে আসিতেছিল—আমি তাহাদিগকে আশ্বাস ও ধমক দিয়া এক প্রকার দৌড়াইলাম। ঘটনা স্থলে যাইয়া দেখি সত্যই একটি 'দেশী' শিশুর মাথা কিছুটা কাটিয়া গিয়াছে।

পাশেই ডাক্তারখানা ছিল, আমি ডাক্তারের ব্যবস্থা করিয়া শিশু এবং তাহার মা-বাবাকে সান্ত্বনা দিলাম এবং চিকিৎসার ব্যয় বহন করিব বলিলাম। এদিকে সমাগত সকলে কানুকে লইয়া বেশ একটা গোল পাকাইয়া উঠাইয়াছে। দেখিলাম সব 'দেশী', ভাটিয়া যে দুই চারিটি ছিলেন তাহারা নির্ব্বাক্ দর্শক মাত্র। 'দেশী'দের মধ্যে ক্রমে দুইটি দল হইয়া গেল। কানু যে নির্দ্দোষ ইহাই সাব্যস্ত হইল। আমি কানুকে সহ সাইকেল লইয়া বাসার সম্মুখে আসিয়া দেখি সেখানেও কতক লোক জড় হইয়াছে—স্ত্রী ও মেয়েরা সেখানেই দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে। আমরা উহাদের নিকট পৌঁছাইতেই শুনিলাম— "মা, তোমরা ভিতরে এস, বাবা তাকে নিয়ে এলেন ব'লে" বলাই বলিতেছে। আমি বলিলাম, "ভিতরে নাকি ?" স্ত্রী বলিল, "হ্যাঁ, তুমি যাওয়ার পরই ও ভিতর থেকে আমাদের ডাক্‌লো, বল্‌লো, 'আরে, ওখানে কেঁদে কি হবে ? যাঁর কাছে কাজ হবে তাঁর কাছে কাঁদ্‌বে এস' ;" আমরা ভিতরে যাইতেই বলাই দৌড়িয়া তার দাদার কাছে গেল, তারপর আমার নিকটে আসিল কি যেন সে বলিবে। আমি বলিলাম, "কি রে ?" ইঙ্গিতে আমাকে ঘরে যাইতে বলিল। একটা কথা লিখিতে আমার ভুল হইয়াছে —বাবার সম্বন্ধে সমস্ত কথা অন্যের অগোচরে বলাই আমার কাছে বলিত, আমি কখনও কাহারও নিকট কিছু প্রকাশ করিলে বলাই বিরক্ত বোধ করিত।

ঘরে গিয়া জিজ্ঞাসা করায় বলাই বলিল, "তুমি ত গেলে হরিসভায়, মা'রা বাইরে চীৎকার আরম্ভ করলো—আমার মনে

রুদ্ররূপে দুর্ভাগ্য তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত। এখানে একা মুসলমান নয়, হিন্দু মুসলমান মিলিতভাবে এই ক্ষুৎপিপাসাক্লিষ্ট, কঙ্কালসার, আশ্রয়প্রার্থী মানুষগুলিকে অপসারিত করিতে বদ্ধপরিকর। দিন নাই, রাত্রি নাই, দলে দলে দেশী' লোকেরা লাঠি, সড়কি প্রভৃতি হাতিয়ার হস্তে, কখনও পায়ে হাঁটিয়া, কখনও বা মোটর ট্রাকে "কোচবিহারীর কোচবিহার", "ভাটিয়ার স্থান নাই", "ভাটিয়াকে এ দেশ ছাড়্তে হবে" ইত্যাদি শ্লোগানে আকাশ বাতাস কাঁপাইয়া তুলিত। বাস্তুত্যাগীরা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এবং কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ়। কয়েকটি বন্ধুর সাহায্যে আমি ধীরে ধীরে সহরের বিভিন্ন অঞ্চলের এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের বাস্তুত্যাগীদের লইয়া একটি কমিটি সংগঠন করিতেছিলাম। আমাকে উহার সম্পাদক করা হইল, কিন্তু 'রাজ সরকার' এই কমিটীকে অনুমোদন দিলেন না। সুতরাং রাজরোষও আমার উপর নিপতিত হইল।

ইত্যবসরে একদিন সন্ধ্যার পর বাসায় বসিয়া আছি, একটি অচেনা বালক আসিয়া সংবাদ দিল "আপনাদের বাসার কানু (আমার জ্যেষ্ঠপুত্র) হরিসভার নিকটে সাইকেল চাপা দিয়াছে, দেশী লোকেরা সাইকেল কাড়িয়া লইয়া বেড় দিয়াছে।" সংবাদ শুনিয়াই আমি দ্রুত হরিসভার দিকে ছুটিলাম। আমার স্ত্রী ও মেয়েরা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে আমার পিছনে পিছনে আসিতেছিল—আমি তাহাদিগকে আশ্বাস ও ধমক দিয়া এক প্রকার দৌড়াইলাম। ঘটনা স্থলে যাইয়া দেখি সত্যই একটি 'দেশী' শিশুর মাথা কিছুটা কাটিয়া গিয়াছে।

পাশেই ডাক্তারখানা ছিল, আমি ডাক্তারের ব্যবস্থা করিয়া শিশু এবং তাহার মা-বাবাকে সান্ত্বনা দিলাম এবং চিকিৎসার ব্যয় বহন করিব বলিলাম। এদিকে সমাগত সকলে কানুকে লইয়া বেশ একটা গোল পাকাইয়া উঠাইয়াছে। দেখিলাম সব 'দেশী', ভাটিয়া যে দুই চারিটি ছিলেন তাহারা নির্ব্বাক্ দর্শক মাত্র। 'দেশী'দের মধ্যে ক্রমে দুইটি দল হইয়া গেল। কানু যে নির্দ্দোষ ইহাই সাব্যস্ত হইল। আমি কানুকে সহ সাইকেল লইয়া বাসার সম্মুখে আসিয়া দেখি সেখানেও কতক লোক জড় হইয়াছে—স্ত্রী ও মেয়েরা সেখানেই দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে। আমরা উহাদের নিকট পৌঁছাইতেই শুনিলাম— "মা, তোমরা ভিতরে এস, বাবা তাকে নিয়ে এলেন ব'লে" বলাই বলিতেছে। আমি বলিলাম, "ভিতরে নাকি ?" স্ত্রী বলিল, "হ্যাঁ, তুমি যাওয়ার পরই ও ভিতর থেকে আমাদের ডাক্‌লো, বল্‌লো, 'আরে, ওখানে কেঁদে কি হবে ? যাঁর কাছে কাজ হবে তাঁর কাছে কাঁদ্‌বে এস' ;" আমরা ভিতরে যাইতেই বলাই দৌড়িয়া তার দাদার কাছে গেল, তারপর আমার নিকটে আসিল কি যেন সে বলিবে। আমি বলিলাম, "কি রে ?" ইঙ্গিতে আমাকে ঘরে যাইতে বলিল। একটা কথা লিখিতে আমার ভুল হইয়াছে —বাবার সম্বন্ধে সমস্ত কথা অন্যের অগোচরে বলাই আমার কাছে বলিত, আমি কখনও কাহারও নিকট কিছু প্রকাশ করিলে বলাই বিরক্ত বোধ করিত।

ঘরে গিয়া জিজ্ঞাসা করায় বলাই বলিল, "তুমি ত গেলে হরিসভায়, মা'রা বাইরে চীৎকার আরম্ভ করলো—আমার মনে

হলো বাবার কথা ; তাই বাবার কাছে গিয়ে 'দাদাকে কেউ যেন না মারে' তাঁকে বল্‌তে লাগলাম, কিন্তু কথা কি শুনে? আমার বড় ভয় হলো দাদাকে বুঝি বা মার্‌বেই। এদিকে বাবাও কথা কয় না, আমি কেঁদে ফেল্‌লাম, ভারী রাগ হলো। অমনই কে যেন আমার কানে কানে বল্‌লো, 'তোর দাদাকে কেউ মারবে না। তোর বাবা তাকে নিয়ে এলো বলে।' পরে দেখি বাবা হাস্‌ছে—বল্‌ছে, 'ভয় নাই।' আমি প্রণাম ক'রে বেরিয়ে আস্‌তে না আস্‌তেই দেখি তুমি দাদাকে নিয়ে এসেছ। কেঁদে কেঁদে বল্‌লে ঠাকুর কথা শুন্‌বেই, না বাবা ?" আমি শুধু মনে মনে তাঁকে প্রণাম জানাইয়া বলিলাম, "ঠাকুর, কখন কি ভাবে যে দয়া কর তা কি ছাই বুঝ্‌তেই পারি ? তোমার উপর বলাইর নিষ্ঠা—তোমারই দেওয়া, তা' যেন তার বজায় থাকে।"

১৩৫৩ সন হইতে ১৩৫৬ সন পর্য্যন্ত প্রায় প্রতিদিনই বলাইর সহিত ঠাকুরের লীলা চলিত। আমি কোন কথা লিখিয়া রাখি নাই। স্মরণে যাহা আছে শুধু তাহাই লিখিতেছি। ঘটনাগুলির পৌর্ব্বাপর্য্যেও ইতরবিশেষ হইতে পারে। আহ্নিক করিয়া বাহিরে আসিলে আমি প্রায়শঃই বলাইকে জিজ্ঞাসা করিতাম, সেও অকপটে সব কথা বলিত। কিন্তু আমি কথাগুলি অনেকের কাছেই বলিতাম। অবশেষে ১৩৫৭ সালের প্রথম দিকে একদিন জিজ্ঞাসা করাতে বলাই দুঃখিতভাবে বলিল, "বাবা, আমাকে আর জিজ্ঞাসা করিও না, তোমার কাছে বলা নিষেধ হইয়াছে।" তদবধি আহ্নিক সম্বন্ধে কোন কথা বলাইকে আর জিজ্ঞাসা করি না।

বলাই এখনও প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যায় আহ্নিক করে, এখনও গান গায়, বলে 'বাবার নিকট গান গাহিয়াই আনন্দ পাওয়া যায় বেশী।' জয় গুরু। —শ্রীঅন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য

এই সম্বন্ধে শ্রীমান্ বলাইকে জিজ্ঞাসা করাতে সে আমাকে নিজ হাতে যে বিবরণ লিখিয়া দিয়াছে তাহা হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। —সম্পাদক।

—"আমি তখন বিশেষ ছোট না হইলেও ছোটই ছিলাম। এখন আমার বয়স পনর। অতি ছোটবেলা হইতেই কেন জানি না ভগবান্‌কে বিশ্বাস করিতাম এবং ভগবান্ বলিয়া যে একজন কেহ আমাদের মাথার উপর আছেন ও সর্ব্বদাই আমাদের ভাল মন্দ প্রভৃতি কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করেন তাহাও বিশ্বাস করিতাম। কিন্তু তিনি দেখিতে কেমন তাহা জানিতাম না।

তারপর যতই দিন যাইতে লাগিল ততই আমি আমার বাবাকে রাত্রিতে খাওয়া দাওয়ার পর বিছানায় শুইয়া ভগবান্ সম্বন্ধে অজস্র প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতাম এবং কতক প্রশ্নের উত্তর মনঃপূত হইত, কতক প্রশ্নের উত্তর মনঃপূত হইত না।

ইতিপূর্ব্বে, মানে কুচবিহার আসিবার পূর্ব্বে, আমি বাবা, মা ও ছোট বোন সহ একবার কাশীতে যাই এবং তথায় আমরা পিশামহাশয়ের (অর্থাৎ শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজের) বাড়ীতে উঠি। এই সময় আমি দুই তিন দিন বাবার সহিত তাঁহার গুরুদেবের আশ্রমে যাই। গুরুদেব বলিতে যে কি বুঝায় তাহা তখন আমি বুঝিতাম না, তবে বাবা আমাকে গুরুদেব সম্বন্ধে

অনেক অদ্ভূত ও আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য গল্প বলিতেন। ইহার ফলে ক্রমেই আমার মন গুরুদেবের প্রতি আসক্ত হইতে লাগিল এবং তখন হইতে আমি গুরুদেবকেই ভগবানের স্ব-মূর্ত্তি বলিয়া বুঝিয়া লইলাম।

ইতিমধ্যে কুচবিহার থাকাকালে আমি একদিন জ্যাঠা-মহাশয়ের বাড়ী ডিমের ঝোল দিয়া নিমন্ত্রণ খাইয়াছিলাম। বাসায় আসিয়া বাবার কাছে জানিতে পারিলাম যে গুরুদেব ডিম খাইতে নিষেধ করিয়াছেন। সেই দিন হইতে আমি ডিম খাওয়া ত্যাগ করিয়াছি—আজ পর্য্যন্তও ডিম খাই নাই। তারপর সেই দিন সন্ধ্যাবেলায় বাবার আদেশমত আমি ডিম খাওয়ার দরুণ গুরুদেবের ফটোর সম্মুখে বসিয়া ক্ষমা ভিক্ষা চাহিলাম। সেইদিন হইতে আমি প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় গুরুদেবের নিকট সন্ধ্যা করিতে বসিতাম এবং গান করিয়া তাঁহাকে ডাকিতাম। ইহাতে আমার বেশ আনন্দ লাগিত। আমরা যে দোকান হইতে মাসিক জিনিষ-পত্র লইতাম, সেই দোকানখানা ব্যতীত আশেপাশে, মানে কাছাকাছি, আর কোন বাড়ী ছিল না। দোকানখানাও ঠিক কাছে ছিল না। আমাদের বাড়ীর সম্মুখে ছিল বাঁশ ঝাড়। এই অবস্থায় আমি অনেকদিন রাত্রি প্রায় দশটা এগারটার সময় দোকান হইতে জিনিষ পত্র আনিয়াছি, ইহাতে আমার মোটেই ভয় করে নাই। ইহার কারণ, এই অবস্থায় আমি সব সময় গুরুদেবের ফটোকে ভিতরের দৃষ্টির সম্মুখে রাখিয়া চলিতাম। এক এক দিন প্রস্রাবের সময় গুরুদেবকে আমি সম্মুখে দেখিতে পাইতাম। পাছে প্রস্রাব তাঁহার শরীরে লাগে এই আশঙ্কায়

আমি একদিন বাবাকে সব বলিলাম এবং বাবার আদেশ মত আমি এর পর হইতে ঐ সময় গুরুদেবের ফটোকে সম্মুখ হইতে সরাইয়া লইতাম। গান গাহিয়া গুরুদেবকে ডাকিতে আমার এত আনন্দ লাগিত যে গলা ছাড়িয়া গান গাহিয়া ডাকিতাম। ১৯৪৮ সনে যখন আমি ক্লাস টু-তে পড়ি, সঠিক তারিখ আমার মনে নাই, তখন মনে আছে যে একদিন সন্ধ্যাবেলায় বাবা বাহিরে চেয়ারের উপর সন্ধ্যা করিতে বসিয়াছেন এবং আমি কেবলমাত্র গুরুদেবের নিকট বসিয়াছি, এমন সময় পাড়ার একটি ছেলে আসিয়া বাবাকে বলিল যে আমার দাদা রাস্তায় সাইকেল এক্সিডেণ্ট করিয়াছে, বাবা যেন তাড়াতাড়ি যান। এই কথা শুনিবামাত্র বাবা কাপড় গায়ে দিয়াই ঘটনাস্থলে ছুটিলেন। উহা শুনিবামাত্র আমারও মনের অবস্থা যে কিরূপ হইয়া গেল তাহা লিখিতে পারিতেছি না। আমি তৎক্ষণাৎ দৌড়াইয়া রাস্তায় আসিয়া দেখি যে, আমার বোনসহ মা ইতিমধ্যে রাস্তায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সেদিন ছিল জ্যোৎস্না রাত্রি। সারা রাস্তা জ্যোৎস্নার আলোয় আলোকিত হইয়াছিল। রাস্তায় আসিয়া সকলের মুখের দিকে তাকাইতেই আমারও দাদার চিন্তায় কান্না পাইল। মনে হইল দাদাকে বুঝি বা জেলে লইয়া যায়।

ঠিক এই সময় আমার হঠাৎ গুরুদেবের কথা মনে হইল। ইতিপূর্ব্বে বাবার নিকট শুনিয়াছিলাম যে কেহ গুরুদেবকে যদি প্রাণপণে ডাকে তবে তিনি হাজার বিপদ আসিলেও তাহাকে রক্ষা করেন। বাড়ীতে যে তখন কেহই নাই সে কথা আমার

খেয়ালই ছিল না। আমি তখন রাস্তায় আর এক মুহূর্ত্ত দেরী না করিয়া ঝড়ের মত দৌড়াইয়া আসিয়া গুরুদেবের নিকট বসিলাম ও প্রাণপণে তাঁহাকে ডাকিলাম। কিছুক্ষণ পরে আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম যে, গুরুদেবের সেই ফটো হইতে প্রথমে একটি জ্যোতি বাহির হইল, তারপর দেখিতে পাইলাম গুরুদেবকে। তিনি আমাকে বলিলেন, "ভয় নাই"। এই কথার পর আর তাঁহাকে সেখানে দেখিতে পাই নাই। ইহার কিছুক্ষণ পরে আচম্‌কা এক কোলাহলে আমার ধ্যান ভঙ্গ হইল। বাহিরে আসিয়া দেখি যে দাদা, বাবা ও আরও অন্যান্য লোক আমাদের বাসার ভিতরে প্রবেশ করিতেছে ও দিদি আঙ্গিনায় মাদুর পাতিয়া বসিয়াছে। আমি সেই মাদুরের নিকট গেলে পর দিদি আমাকে তাঁহার কোলে টানিয়া লইলেন, আমিও তাঁহার কোলের উপর মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম।

ইহার পর হইতে আমি নিয়মিতভাবে গুরুদেবকে সন্ধ্যাবেলায় ডাকিতাম। কিন্তু প্রতিদিন আমার মন বসিত না। তবু বাবার কথা মত আমি সব সময় 'জয় গুরু' বলিয়া বাড়ীর বাহির হইতাম। তবে মাঝখানে আমার মতিভ্রম হইয়াছিল।

১৯৫৪ সনে যখন ক্লাস এইটে পড়ি তখন আমার দাদার বিবাহ হয়। এই সময় আমি একা এক ঘরে পড়িতাম। আমার সম্মুখে ছিল একটা জানালা ও ডান পাশে একটা দরজা। একদিন রাত্রে আমি সমস্ত পড়া তৈরী করার পর ইতিহাস বইখানা খুলিয়াছি, এমন সময় বাড়ীর ভিতর হট্টগোল শুনিতে পাইয়া বাড়ীর ভিতর গেলাম ও দেখিলাম যে আমার বৌদির

বিড়ালের কামড় খাইয়া ফিট্ হইয়াছে। তাঁহার ফিট্ ভাঙ্গানোর জন্য অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত প্রাথমিক চিকিৎসা হইল, কিন্তু ইহাতে ফল না হওয়ায় বোধ হয় বাবা ডাক্তার ডাকিতে গেলেন।

আমি তখন ধীরে ধীরে আমার পড়ার ঘরে আসিয়া চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িলাম, আমার প্রতি মুহূর্ত্তে মনে হইতে লাগিল, 'গুরুদেব, এ কি হইল!' এইরূপে কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর আমার চোখ ছল্ ছল্ হইয়া উঠিল, তখন আমি আমার সম্মুখের জানালার কাছে গুরুদেবের মাথা আবছা-ভাবে দেখিতে পাইলাম। তৎক্ষণাৎ আমি চেয়ার হইতে উঠিয়া যেখানে প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় সন্ধ্যা করিতে বসি সেইখানে গিয়া সন্ধ্যা করিতে বসিলাম। আমি তখন গুরুদেবকে শুধু এই কথাটাই বলিয়াছিলাম, 'গুরুদেব, এ কি হইল?' তারপর যখন আমি সন্ধ্যা করিয়া উঠিলাম তখন কেন জানি না আমার মন হইতে ভয় একদম চলিয়া গিয়াছে। তারপর আমি (ফিট্ হওয়ার পর) প্রথম বৌদির নিকট গেলাম এবং দেখিলাম যে আমাদের পাড়ার ডাক্তারবাবু বৌদিকে ইন্‌জেক্সন করিতেছেন। আমি সেই সময় আরও লক্ষ্য করিয়াছিলাম যে বাড়ীর সকলের মনেই একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। আমার মনে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে একটুও ভয় ছিল না।

তারপর রাত্রিতে খাওয়া দাওয়া করিয়া শুইয়া পড়িলাম। পরের দিন সকালবেলায় ঘুম হইতে উঠিয়া দেখি যে তখন পর্য্যন্ত বৌদির ফিট্ ভাঙ্গে নাই। ইহাতে বাবা ভীষণ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। তারপর বেলা দশটার সময় আমি যখন

গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া আমার বই খাতা লইয়া স্কুলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি তখন বাবা আমাকে ডাকিয়া বলিলেন যে, এখনও ফিট্ ভাঙ্গিল না। আমি তখন বাবাকে বলিয়া দিলাম যে ভয় নাই, ফিট্ ভাঙ্গিয়া যাইবে, তাঁহার কোন ক্ষতি হইবে না। ইহার পর স্কুল হইতে আসিয়া দেখিলাম যে বৌদির ফিট্ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। —শ্রীঅজয়শঙ্কর ভট্টাচার্য্য

(১০)

শ্রীগিরিধারী লাল ব্যাস

শ্রীশ্রীগুরুদেব যখন শেষ বার (১৯৩৭ সাল) কাশী হইতে কলিকাতা প্রস্থান করেন তাহার দুইদিন পূর্ব্বেই আমি আমার মিত্র রায় গোবিন্দচন্দ্রজীকে সঙ্গে লইয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য গিয়াছিলাম। তাঁহাকে দর্শন করিয়া গোবিন্দচন্দ্রজী চলিয়া আসিবার পর বাবা বলিলেন, "লোকটি ভাল গো।" বাবা কলিকাতায় রওয়ানা হইয়া যাইবার প্রায় দুই মাস পরেই লীলা সংবরণ করেন। এই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণ করিয়া মিত্রবর অত্যন্ত দুঃখিত ও কাতর হইয়া পড়েন। তিনি বাবার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিবেন বলিয়া আশা করিতেছিলেন। একদিন তিনি আমার সঙ্গে দেখা করিয়া অত্যন্ত হতাশ ভাবে বলিলেন, "বাবা ত চলিয়া গেলেন, এখন আমার কি হইবে ?" আমি তাঁহাকে হতাশ হইতে নিষেধ করিলাম এবং তাঁহার হৃদয়ে উৎসাহ সঞ্চার করিয়া বলিলাম, "বাবা যাবেন কোথায় ? তোমার শ্রদ্ধা থাকিলে সবই হইতে পারে ইহাই আমার বিশ্বাস। তিনি যে মহাযোগী, তিনি

তিরোহিত হইলেও সর্ব্বদাই আমাদের নিকটেই বিদ্যমান।" ইহার পর আমি গোবিন্দচন্দ্রজীকে বাবার একখানা ফটো দিলাম ও বলিলাম, "প্রত্যহ দুইবেলা নিয়মিত ভাবে ফটোর সম্মুখে ধূপ জ্বালাইয়া দিও ও আন্তরিক প্রার্থনা নিবেদন করিও।" গোবিন্দচন্দ্রজী আমার নির্দ্দেশ অনুসারে চলিতে লাগিলেন। এইভাবে প্রায় চারি মাস কাল অতীত হইবার পর একদিন সন্ধ্যার সময় তিনি আমার সহিত দেখা করিতে আসেন এবং প্রসঙ্গতঃ বাবার কথা উল্লেখ করেন, ইহার পরেই নিজের গাড়ীতেই বাড়ী ফিরিয়া যান। পরদিন প্রাতঃকালে আবার তিনি আমার নিকট আসিলেন ও পূর্ব্ব দিন যাহা ঘটিয়াছিল তাহা বিস্তারিত ভাবে আমাকে বলিলেন। তিনি বলিলেন, "কাল সন্ধ্যাবেলা আমি যখন বাড়ী ফিরিতেছিলাম তখন হঠাৎ দেখিলাম, আমার দৃষ্টির সম্মুখে স্বুবর্ণ অক্ষরে একটি মন্ত্র লিখিত রহিয়াছে। যদিও মন্ত্রটি স্পষ্টভাবে লিখিত ছিল তথাপি কিছুক্ষণ পরে মানসিক আন্দোলনের ফলে উহার একটি অক্ষর সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়। আশ্চর্য্য এই, সন্দেহ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ স্বুবর্ণ অক্ষরে লিখিত মন্ত্রটি পুনর্ব্বার আমার দৃষ্টিগোচর হইল ও সন্দেহ নিবৃত্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উহা অদৃশ্য হইয়া গেল।" ইহা শুনিয়া আমি বলিলাম, "ইহা বাবার কৃপার জলন্ত দৃষ্টান্ত। যোগীর পক্ষে শরীরে থাকা না থাকা উভয়েই সমান। বস্তুতঃ বাবা সর্ব্বদাই তাঁহার প্রতি শিষ্যের সঙ্গে সঙ্গেই থাকেন।"

আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা শশিকলা বাবাকে অত্যন্ত ভক্তি করিত। তাহার প্রকৃতি খুবই সাত্ত্বিক ছিল। বাবাও তাহাকে স্নেহ

করিতেন এবং আদর করিয়া 'চিরকুমারী' বলিয়া ডাকিতেন। বাবার তিরোধানের সংবাদ পাইয়া উহার অত্যন্ত দুঃখ হইয়াছিল, কারণ উহারও মনে বাবার নিকট হইতে দীক্ষা নেওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল। ঐ সময় ৺কাশীধামে শ্রীশ্রীসিদ্ধি মা নামে একজন সিদ্ধ মহিলা বাস করিতেন। তিনি আধ্যাত্মিক জগতে অত্যন্ত উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। আমি মাঝে মাঝে তাঁহার নিকট যাইতাম, তিনিও আমাকে স্নেহ করিতেন। ১৯৪০ সালে শশিকলা তাঁহার নিকট হইতে যথাবিধি দীক্ষা গ্রহণ করে। আমার বাড়ীর উপর তলায় একটি সুপ্রশস্ত বারান্দা ছিল ও তাহার নিকটে একটি ছোট প্রকোষ্ঠ ছিল, যাহাতে একটি বুক-কেসে বাবার একখানা ছবি রক্ষিত ছিল। প্রত্যহ দুইবেলা ঐ ছবিতে ফুল চড়ান হইত ও ধূপ-ধুনা দেওয়া হইত। যেদিন শশিকলার দীক্ষা হইল সেইদিন যখন উহাকে নিয়া আমি ফিরিলাম তখন বেলা প্রায় আটটা হইবে। আমি ও আমার স্ত্রী দুইজন বারান্দায় বসিয়া কথা বলিতেছিলাম। ইহারই মধ্যে হঠাৎ স্পষ্টরূপে শ্রীশ্রীগুরুদেবের কণ্ঠস্বরে এই বাক্যটি শুনিলাম, "কিগো, এইবার পেয়েছ ত, মা ও বাবা কেমন আছে?" আমরা এই শব্দ শুনিয়াই বিস্মিত ও চমকিত হইয়া উঠিলাম। তখন আর কোন কথা না বলিয়া ঐ প্রকোষ্ঠের দিকে অগ্রসর হইলাম। ওখানে যাইয়া দেখিলাম শশী বাবার ফটোর সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করার পর মাথা উঠাইয়াছে। আমরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল যে বাবার কণ্ঠস্বরে ঐ শব্দ সেও শুনিতে পাইয়াছে। সে আরও বলিল, বহুদিন হইতে সে

নিয়মিত ভাবে প্রতিদিন এই ফটোর সম্মুখে প্রণাম করিয়া দীক্ষার জন্য বাবাকে প্রার্থনা করিত। আজ দীক্ষা পাওয়ার পর সে আনন্দের সঙ্গে বাবাকে প্রণাম করিতে গিয়াছিল। তাহার মনের ভাবটা এই ছিল যে তাহার এত দিনের আকাঙ্ক্ষা বাবার কৃপায় পূর্ণ হইল। ঐ সময়ই বাবার কণ্ঠস্বরে ঐ শব্দ শ্রুতিগোচর হইল।

মহাশক্তি-শ্রীশ্রীমা

মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, এম-এ, ডি-লিট্

(১)

মহাশক্তি জগদম্বার পরম রূপ অখণ্ড ও স্বয়ংপ্রকাশ চৈতন্য—ইহাকে সিদ্ধ যোগিগণ সংবিৎ বা প্রতিভা বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। কোন দেশে বা কোন কালে কোন কারণেই এই স্বরূপের অপলাপ হয় না—ইহা অপরিচ্ছিন্ন প্রকাশাত্মক। ইহা বিচিত্র দৃশ্যের আকারে ভাসমান হইতেছে—এই সকল আকার মূলে সবই ক্ষণিক, কিন্তু এই ক্ষণিক প্রতিভাসের মধ্যেই তাহাদের স্বরূপ পর্য্যবসিত নহে। যদি তাহাই হইত তাহা হইলে স্মরণ অনুসন্ধান প্রভৃতি অন্তঃকরণের ব্যাপারের কোন সার্থকতা থাকিত না। ভগবতীর যেটি পরম স্বরূপ সেইটি সামান্য জ্ঞানাত্মক পরা প্রতিভা। উহাই মূলরূপ এবং দেশ কাল আকার নিমিত্ত প্রভৃতি দ্বারা অনবচ্ছিন্ন। ইহাকে আশ্রয় করিয়াই প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ সমগ্র জগৎ উৎপন্ন হয়, স্থিত হয় ও লীন হয়। নব নব রূপে আভাসমান হওয়াই উৎপত্তি, আভাস ধারার বিষয়তাই স্থিতি ও আভাসের অবিষয়তাই সংহার। এই সকল দৃশ্য বা অর্থ প্রমাতৃগণের নিকট পর পর ভাসমান হয় বটে, কিন্তু মূল স্বরূপ হইতে পৃথক্ ভাবে ভাসমান হয় না। ভূতলে অবস্থিত ঘট যেমন ভূতল হইতে ভিন্ন ভাবে দৃষ্টিগোচর

হয় ইহা তদ্রূপ নহে, বরং দর্পণে প্রতিবিম্বিত রূপ যেমন দর্পণ হইতে অভিন্ন ভাবে প্রতিভাত হয় ইহা সেই প্রকার। অর্থাৎ এই বিশ্ব চিদাত্মাতে প্রতিবিম্বিত হইয়া চিদাত্মার সহিত অভিন্ন ভাবেই প্রকাশমান হয়,—জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের ভান ঐ পরম চৈতন্য-স্বরূপে উহা হইতে অব্যতিরিক্ত ভাবেই ঘটিয়া থাকে।

এই অখণ্ড মহাপ্রকাশে বিশ্ব-বৈচিত্র্য প্রতিভাত হয় কেন? এই প্রশ্নের সমাধান করিতে গেলে বুঝিতে পারা যায়, ইহা তাঁহার স্বাতন্ত্র্য হইতেই হইয়া থাকে। ইহাই মায়ার প্রকৃত স্বরূপ। মায়ারূপ নিমিত্তকে আশ্রয় করিয়া পর সংবিৎ রূপ আধারে অনন্ত বৈচিত্র্য ফুটিয়া উঠে। এই জগদাকার দেহে অজ্ঞানী, অর্থাৎ যে আত্মজ্ঞানহীন বা যাহার মন অবিদ্যা দ্বারা আবৃত সে, বিশ্বরূপ অনন্ত আকার দর্শন করে; কিন্তু এই সকল আকার যাহাকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত হয় তাহাকে দেখিতে পায় না। অবিদ্যা মায়ারই অবস্থান্তর। কামলা রোগে আক্রান্ত রোগী যেমন নেত্রগত বিকার বশতঃ শ্বেতবর্ণ শঙ্খকে পীতবর্ণ দেখিয়া থাকে, অজ্ঞানীর জগৎ দর্শনও কতকটা সেইরূপ। বিদ্যার প্রভাবে অবিদ্যা নিবৃত্ত হইলে অর্থাৎ যোগ-অবস্থা প্রাপ্ত হইলে ঐ সংবিৎ রূপ তত্ত্ব দৃশ্যমান দ্বৈতাকার-বর্জ্জিত কিংবা নির্ব্বিকল্পক রূপে প্রতিভাত হয়। অবশ্য ঐ অবস্থায়ও ভাস্য ও ভাসক রূপ দ্বৈত থাকে বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে চিদ্রূপ আত্ম-সত্তাতে দেহাদি দৃশ্য ও ভাস্যের লেশমাত্রও থাকে না—উহা বিশুদ্ধ অহং রূপে অর্থাৎ

শুদ্ধ দ্রষ্টার রূপে ভাসিতে থাকে। যোগিগণের নিকট আত্মতত্ত্ব দেশ ও কালের দ্বারা অনবচ্ছিন্ন বলিয়া গম্ভীর ও স্তিমিত সমুদ্রের ন্যায় নিশ্চল স্বরূপে অর্থাৎ অনন্ত অদ্বয় রূপে প্রকাশমান হয়।

যাঁহারা পরমাত্ম-তত্ত্ববিদ্ ভক্ত তাঁহারা এই বিশুদ্ধ আত্ম-তত্ত্বেরই ভজন করিয়া থাকেন। এই ভজনে কৈতব নাই অর্থাৎ কাপট্য নাই এবং কৃত্রিমতাও নাই, কারণ স্বভাবতঃ আত্মাই তো সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। ইহার নাম অদ্বৈত ভক্তি। এই অদ্বিতীয় পরমাত্মা বস্তুতঃ সকলেরই নিজ আত্মা। সেখানে সেব্য-সেবক ভাব নাই। কিন্তু জ্ঞানী ভক্ত ভেদভাবকে আহরণ করিয়া সেব্য-সেবক ভাব রচনা করেন—তাঁহারা স্বাত্মস্বরূপ অদ্বয় পদ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়াও স্বভাব বা চিত্তের সরসতাবশতঃ এইরূপ করিয়া থাকেন। বাসনার বৈচিত্র্য বশতঃই এইরূপ হইয়া থাকে। কোন কোন জ্ঞানী পূর্ব্ব সংস্কার বশতঃ যেমন রাজ্য-শাসনাদি করেন, তেমনি কেহ কেহ ঐ কারণেই ভজনও করিয়া থাকেন।

ভগবতীর পরম রূপ শুদ্ধ ভাসক, কিন্তু ভাস্য নহে। উহা ভা-স্বরূপ, উহা অন্য বস্তুর সঙ্গে সংস্পৃষ্ট নহে বলিয়া এক-রসাত্মক, তাই পূর্ণ, সেইজন্যই উহা দেশ ও কালেরও ব্যাপক। যদি ভাস্যরূপ আকার ভা-রূপ ভাসক হইতে ভিন্ন হইত তাহা হইলে তাহার ভানই হইত না। ভান হওয়া ভাস্য বস্তুর ধর্ম্ম নহে, কারণ যদি উহা ভাস্যের ধর্ম্ম হইত তাহা হইলে সর্ব্বদাই ভাস্যের ভান হইত। তাহা ছাড়া আত্মগত রূপে ভানের অনুভবও হইত না।

এই যে ভান বা প্রকাশের কথা বলা হইল ইহাই পরম চৈতন্যরূপা পরমেশ্বরী মহাশক্তি জগদম্বা, ইহা এক ও অদ্বিতীয়, ইহা দ্বৈতের লেশমাত্র সহ্য করে না। এই অখণ্ড চিদেকরস স্বরূপে স্বাতন্ত্র্যবশতঃ বৈচিত্র্যময় বিশ্ব প্রতিভাসমান হয়। বিশ্বই 'দ্বিতীয়' রূপে প্রতিভাত হয়—বস্তুতঃ উহা এক হইতে অভিন্ন, উহাই প্রতিবিম্ব। এই প্রতিবিম্ব থাকুক অথবা না থাকুক চৈতন্যের স্বরূপ সর্ব্বদাই নির্ব্বিকল্প। সৃষ্টিকালে প্রতিবিম্ব ভাসে, কিন্তু প্রলয়কালে উহা ভাসে না। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, সংবিৎ স্বরূপতঃ সর্ব্বদা নির্ব্বিকল্প একরস থাকিলেও স্বাতন্ত্র্য-বশতঃ নিজের মধ্যে নিজেই বাহ্যভাবের স্ফুরণ করে।

এই পরা সংবিৎই মায়ের স্বরূপ। নিজের আত্মার শুদ্ধস্বরূপ জানিলেই মাকে প্রায় জানা হয়—

"জ্ঞাতস্বাত্মস্বরূপো বৈ ততো জ্ঞাস্যসি মাতরম্।"

আত্মরূপ দৃশ্যও নয়, বাচ্যও নয়, তাই এতৎ সম্বন্ধে সাক্ষাৎ উপদেশও চলে না। তবে ইহা বলা চলে যে বিষয়াকারহীন বুদ্ধিতে করণ-ব্যাপারের অপেক্ষা না করিয়াই স্বরূপ-জ্ঞান উৎপন্ন হয়। কারণ এই স্বরূপ দেবাদি তির্য্যগন্ত সকল প্রাণীরই আত্মরূপে ভাসমান হয়। তথাপি উহা যে আমাদের নিকট স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় না তাহার কারণ এই যে দৃশ্য আকার দ্বারা আমাদের বুদ্ধি আচ্ছাদিত। তথাপি মেঘাচ্ছন্ন সূর্য্যের ন্যায় কিঞ্চিৎ প্রকাশ থাকেই, কারণ ঐ প্রকাশের দ্বারাই সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সকলের নিকট সকল পদার্থ ভাসমান হয়। সুতরাং আত্মা সর্ব্বত্রই ভাসমান হইলেও কেবল শুদ্ধ বুদ্ধিতে অভিব্যক্ত হয়।

করণের ব্যাপার কর্ত্তাতে প্রবৃত্ত হয় না, তাই আত্মদর্শনে আচার্য্য বা গুরুর সাক্ষাৎ কোন উপযোগ নাই। পরাগ্‌দৃষ্টি শিষ্যের নিকট আত্মা অত্যন্ত দূরে। গুরু শুধু তাহার প্রত্যগ্‌ দৃষ্টি উৎপাদন করিয়া দেন। তখন সঙ্গে সঙ্গে আত্মা যে নিত্য-সন্নিহিত তাহা বুঝিতে পারা যায়।

এই পরা সংবিৎ বা আত্মাই মহাশক্তি 'মা'—ইনি সর্ব্বদাই বিকল্পশূন্য। দর্পণ যেমন সর্ব্বদাই দর্পণ, প্রতিবিম্ব ভাস্থক আর নাই ভাস্থক দর্পণ দর্পণই থাকে,—তদ্রূপ সৃষ্টি বা প্রপঞ্চের প্রকাশ কালেও চৈতন্য যেমন নির্ব্বিকল্প তদ্রূপ প্রপঞ্চের সংহার-কালেও উহা তদ্রূপই নির্ব্বিকল্প থাকে। সৃষ্টি ও সংহারে চৈতন্যের কোন বিকার হয় না। চৈতন্য সব সময়ে চৈতন্যই, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

(২)

ভগবতী জগদম্বার পরম রূপ অখণ্ড একরস চৈতন্য, ইহা বলা হইল। কিন্তু তাঁহার অপর রূপও তো আছে। তাঁহার পরম রূপ নিরাকার, কিন্তু অপর রূপ সাকার। যোগিগণ বলেন, তাঁহার অনন্ত সাকার রূপ আছে। কিন্তু সেই সকল রূপের উর্দ্ধে একটি প্রধান রূপ আছে যাহার তুলনায় অন্য সকল রূপই অপ্রধান-রূপে পরিগণিত হয়। এই প্রধান রূপটি এক ও অভিন্ন। ইহা যাবতীয় অপ্রধান অপর রূপের শিখরস্থিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই অপর রূপটি এক হইলেও তাহা যে কি প্রকার তাহা ভাষাতে বর্ণনা করা চলে না, কারণ রুচিভেদে, বাসনাভেদে

ও দৃষ্টিভেদে সেই শিখরস্থিত এক রূপই এক এক ভক্তের নিকট এক এক ভাবে প্রতিভাত হয়।

আমরা এখানে একটি বিশিষ্ট ধারা অবলম্বন করিয়া সেই প্রধান অপর রূপের ধাম ও স্বরূপ বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিব। যে পরম ধামে এই প্রধান অপর রূপ বিরাজমান রহিয়াছেন তাহার স্বরূপ অনুধাবন করিতে হইলে বিশ্ব-সংস্থানের একটা ধারণা থাকা আবশ্যক। আমরা যাহাকে ব্রহ্মাণ্ড বলি তাহাতে চতুর্দ্দশ ভুবন বিদ্যমান রহিয়াছে। তন্মধ্যে সাতটি ঊর্দ্ধ ভুবন এবং সাতটি অধোভুবন। পাতাল নরকাদি অধোভুবনের অন্তর্গত। ভূলোক হইতে সত্যলোক পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধ ভুবন বলা চলে। অন্তরিক্ষ ও স্বর্গাদি ইহারই অন্তর্গত। প্রত্যেকটি ভুবন এক একটি স্তর। প্রতি স্তরকে অবলম্বন করিয়া অগণিত লোক লোকান্তর রহিয়াছে। এই সব নিয়াই একটি ব্রহ্মাণ্ড। এই প্রকার অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রহিয়াছে। তাহা ছাড়া ঊর্দ্ধে অন্যান্য বিভাগও আছে। তাহাতে শুদ্ধ এবং অশুদ্ধ স্তর-বিন্যাসও পরিদৃষ্ট হয়। এই সব নিয়া সমগ্র বিশ্বরাজ্য। ইহার বাহিরে সৃষ্টির কোন নিদর্শন নাই। অনন্ত ব্যাপী জ্যোতীরাশি বিরাজ করিতেছে। এই জ্যোতির ঊর্দ্ধে অপরিচ্ছিন্ন চিদাকাশ বিদ্যমান। যোগিগণ বলেন, চিদাকাশের মধ্যে একটি দিগন্তব্যাপী মহাসমুদ্র বিরাজ করিতেছে, ইহাকে সুধাসিন্ধু বা অমৃতের সমুদ্র বলিয়া বর্ণনা করা হয়। এই মহাসমুদ্রের মধ্যে কেন্দ্রস্থলে নবরত্ন-মণিরচিত নবখণ্ডাত্মক একটি দ্বীপ আছে। ইহাকে মণিদ্বীপ*

* মণিদ্বীপের বিস্তারিত বর্ণনা দেবী ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধে ১০—১২

বলে। এই দ্বীপের মধ্যে আছে কদম্ব বন, তাহাতে আছে চিন্তামণি-গৃহ বা মন্দির। সেই মন্দিরে আছে পঞ্চব্রহ্মময় মঞ্চ।

অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের ললিতোপাখ্যানে ও শিবরহস্যেও (অধ্যায় ১৩) ইহার বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। "চণ্ডী" নামক হিন্দী মাসিকপত্রের একাদশ খণ্ডে পণ্ডিত শ্রীহরি শাস্ত্রী দাধীচ লিখিত 'মণিদ্বীপ কা সৈর' নামক যে অনুভূতিমূলক লেখমালা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা অনেকাংশে দেবীভাগবতের বর্ণনার অনুরূপ। ইহা শাক্তগণের বিবরণ। কিন্তু বৈষ্ণবগণও এই মণিদ্বীপের বর্ণনা করেন। সুন্দরী তন্ত্রের অন্তর্গত আলমন্দার সংহিতার ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ও পুরাণসংহিতার ৩২শ অধ্যায়ে ভগবানের নিজ ধাম রূপে এই দ্বীপের বর্ণনা আছে। বলা বাহুল্য, ইহা সুপ্রসিদ্ধ শ্বেতদ্বীপ হইতে বিভিন্ন। আলমন্দার সংহিতা অনুসারে ভগবানের পারমার্থিক বা বাস্তবী লীলা এই স্থানেই হইয়া থাকে। এই স্থান অক্ষর ব্রহ্মের হৃদয়রূপ চিদাকাশে অবস্থিত। বস্তুতঃ এখানকার ভূমি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ সবই চিন্ময়। সেখানে আছে সুধা-সমুদ্র, তার মধ্যে মণিদ্বীপ—"সুধাব্ধিস্তত্র বিততঃ, কোটিযোজনকস্য চ। তস্য মধ্যে চ কোট্যর্দ্ধ-যোজনং মণিদ্বীপকম্।" এই দ্বীপে নবরত্নময় নয়টি খণ্ড আছে, যাহাতে নবরসের লীলা নিরন্তর চলিতেছে। ইহার মধ্যে মধ্য খণ্ডে, যাহা পদ্মরাগ মণিময়, শৃঙ্গারশালা বিদ্যমান। ইহাই আনন্দভূমি। অষ্টদল কমলের ইহাই যেন কর্ণিকা। ইহার আট্ দিকে আটটি খণ্ড আছে। আলমন্দার সংহিতা মতে নিত্য বৃন্দাবনের লীলা প্রাতিভাসিক এবং ব্রজভূমির লীলা ব্যাবহারিক। পুরাণ সংহিতাতে যে বর্ণনা আছে তাহাও প্রায় এইরূপ। তাহাতে আছে—

অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড প্রপঞ্চাদ্ বহিরুদ্গতঃ।
চিদাকাশো মহানাস্তে লীলাধিষ্ঠানমদ্ভুতম্॥
যত্র দিব্যঃ সুধাসিন্ধুঃ কোটি যোজন বিস্তৃতঃ।

* * *

কোট্যর্দ্ধমানতস্তস্মিন্ মণিদ্বীপো মনোহরঃ।
নবখণ্ডাত্মকঃ শ্রীমান্ নবরত্নবিভূষিতঃ॥ ইত্যাদি।

ইহার মধ্যভূমিতে "অখণ্ড মণিজ" মূল মন্দির প্রতিষ্ঠিত।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র ও ঈশ্বর এই মঞ্চের চারিপাদ। মঞ্চের উপর ফলক রূপে আছেন সদাশিব, ইহাই মুখ্য আসন। এই আসনের উপরে অনাদি-মিথুন পর-চৈতন্যময় পরমেশ্বর ও পরমেশ্বরী অভিন্ন রূপে বিরাজ করিতেছেন। পরম পুরুষ ও পরমা প্রকৃতি রূপে ইঁহারা সাধকগণের নিকট পরিচিত।

ইহাই বিশ্ব জননীর প্রধান অপর রূপ (অবশ্য এক দিক্ দিয়া দেখিলে)। ভগবতীর অথবা ভগবানের যেটি পরম স্বরূপ তাহা নিরাকার সংবিৎ-মাত্র—সৃষ্টিমুখে সেই নিরাকার সংবিৎই নিত্য যুগল রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন।*

---

* সাধকগণ মহাষোঢ়া ন্যাসে ন্যস্ততনু হইয়া অনন্যচিত্তে এই স্বরূপেরই ধ্যান করিয়া থাকেন। শ্রীক্রমোত্তম নামক গ্রন্থে আছে যে, নিম্নলিখিত প্রকারে ভাবনা করিতে হইবে।—সর্ব্বপ্রথম অমৃত সমুদ্র, তার মধ্যে স্থবর্ণ দ্বীপ, তাতে কল্পবৃক্ষ বন, তাতে নব মাণিক্য মণ্ডপ, তাতে নবরত্নময় সিংহাসনরূপী কমল। এই কমলের মধ্যে আছে ত্রিকোণ এবং ত্রিকোণের মধ্যবিন্দুতে অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। ইহার লাবণ্য কোটি-কন্দর্পকে লজ্জিত করে, ইহার মুখকমল মন্দ মন্দ স্মিতযুক্ত, নেত্র তিনটি, ললাটে চন্দ্র এবং বসন ও আভরণ সবই দিব্য। ইনি চতুর্ভুজ—হাতে আছে কপাল-পাত্র, চিন্মুদ্রা, ত্রিশূল ও পুস্তক। মুখ ও চক্ষু সদানন্দময়। শ্রীক্রমোত্তমে অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তির ধ্যানের কথা আছে। তবে ইহাও বলা হইয়াছে যে ঐ মূর্ত্তিকে শুধু পুরুষরূপে বা মাতৃরূপেও ধ্যান করা চলে। নিষ্কল ধ্যানের ত কথাই নাই। ভাবনোপনিষদ, তন্ত্ররাজ প্রভৃতিতে এই মানব-দেহকেই নবরত্ন দ্বীপ ও পুরুষার্থকে সাগর ভাবনা করিতে বলা হইয়াছে। ইহার বিস্তারিত বিবরণ এখানে নিষ্প্রয়োজন।

মণিদ্বীপের বিশেষ আলোচনা আমরা এখানে করিব না, কিন্তু এইস্থলে জগদম্বার অপ্রধান অপর রূপের সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক মনে হইতেছে। সদাশিব, ঈশ্বর, রুদ্র, বিষ্ণু ও ব্রহ্মা ইঁহারা অধিকারী পুরুষ। মায়ের অনুগ্রহাদি পঞ্চকৃত্য ইঁহারাই সম্পাদন করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, ইঁহারা সকলেই মায়েরই এক একটি রূপ। এতদ্ব্যতীত গণেশ, স্কন্দ, দিক্পালগণ, কুমারী, লক্ষ্মী প্রভৃতি শক্তিবর্গ এবং যক্ষ রক্ষ অসুর নাগ কিম্পুরুষ প্রভৃতির মধ্যে যাবতীয় পূজ্যরূপ বস্তুতঃ মায়েরই রূপ। তাঁহার মায়ায় মোহিত হইয়া লোকে তাঁহাকে চিনিতে পারে না। তিনি ব্যতীত পূজ্য বা ফলদায়ী আর কেহ নাই। যে যে-ভাবে তাঁহাকে ভাবনা করে সে সেই ভাবেই ফললাভ করিয়া থাকে। বস্তুতঃ তিনি বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন দেশে জীবানুগ্রহের জন্য বিরাজ করিতেছেন। মূলে সব রূপ তাঁহারই রূপ। শাস্ত্রানুসারে তিনি কাঞ্চীতে কামাক্ষীরূপে, কেরলে কুমারীরূপে, আনর্ত্তে অম্বারূপে, মলয়ে ভ্রামরীরূপে, করবীরে মহালক্ষ্মীরূপে, মালবে কালিকারূপে, প্রয়াগে ললিতারূপে, বিন্ধ্যে বিন্ধ্যবাসিনীরূপে, বারাণসীতে বিশালাক্ষীরূপে, গয়াতে মঙ্গলাবতীরূপে, বঙ্গে সুন্দরীরূপে ও নেপালে গুহ্যেশ্বরীরূপে বিরাজ করিতেছেন। ইহাই তাঁহার দ্বাদশ রূপ। ইহা ছাড়া তাঁহার আরও অসংখ্য রূপ শাস্ত্র হইতে জানিতে পারা যায়।

(৩)

মায়ের মুখ্য ঐশ্বর্য্য অপরিচ্ছিন্ন। স্বরূপ হইতে ভিন্ন কোন কারণ অপেক্ষা না করিয়াই তিনি জগতের আকারে স্ফুরিত

হইতেছেন। এই সকল আকারকে তাঁহার স্বাংশ বা তাঁহা হইতে ভিন্নও বলা চলে না, কারণ তিনি অখণ্ড চিন্ময় বলিয়া তাঁহার কোন অংশ নাই। তিনি অদ্বয় চিন্ময় স্বরূপে স্থিত থাকিয়াও অনন্ত জগতের আকারে স্ফুরিত হইতেছেন। আবার অনন্ত জগদাকারে স্ফুরিত হইয়াও তিনি অদ্বৈত চিৎ-স্বরূপ হইতে স্খলিত হন না। ইহাই তাঁহার ঐশ্বর্য্য। বিচিত্র জগদাকার প্রতিবিম্ব তুল্য বলিয়া তিনি নিত্যই নির্ব্বিকার।

মায়ের অবান্তর ঐশ্বর্য্যেরও গণনা হয় না। ঐশ্বর্য্য মাত্রই অঘটিত ঘটনের সামর্থ্য। পরম স্বাতন্ত্র্য-রূপা স্ব-মায়া দ্বারা তিনি নিজেকে অজ্ঞানাবৃত করেন ও অনাদি জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহে পতিত হন অর্থাৎ সংসারী সাজেন। তারপর শিষ্যভাব প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় গুরুর সকাশ হইতে আত্মতত্ত্ব জানিয়া নিত্য-মুক্ত হইয়াও আবার মুক্ত হন। এই অবিদ্যা মায়িক বলিয়া সত্য সত্য বন্ধন নাই। তাই তিনি নিত্য-মুক্ত। বিনা উপাদানে তিনি অনন্ত বৈচিত্র্যময় জগৎ নির্ম্মাণ করেন, ইহাই তাঁহার ঐশ্বর্য্য। তাঁহার এইরূপ অগণিত ঐশ্বর্য্য আছে।

(৪)

মায়ের অপ্রধান পরম ধামের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু খণ্ড খণ্ড ধাম যে তাঁহার কত আছে তাহা কেহই নির্ণয় করিতে পারে না। এইখানে শাস্ত্রানুসারে বিভিন্ন সাধক ও যোগীর অনুভূতিমূলক কয়েকটি ধামের বর্ণনা দেওয়া যাইতেছে।

১। শ্রীনগর—ইহার প্রাচীন নাম অতস্তদীয়। প্রসিদ্ধি

আছে যে মেরুতে চারিটি শৃঙ্গ আছে—ইহার তিনটি শৃঙ্গে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রের তিনটি পুরী আছে, চতুর্থটিতে মহামায়ার পুরী বিরাজ করিতেছে। ইহার নাম শ্রীপুর বা শ্রীনগর। ইহা চারিশত যোজন দীর্ঘ ও চারিশত যোজন আয়ত। ইহা সাতটি প্রাকার দ্বারা বেষ্টিত। প্রবেশ দ্বার চারিটি। প্রবেশ স্থানে শালা, গোপুর প্রভৃতি আছে। বাহিরের প্রাকারটি লৌহের, ভিতরেরটি স্বুবর্ণের। ভিতরের প্রাকারগুলি ক্রমশঃ পিতল, তাম্র, সীসা, দস্তা, পঞ্চলৌহ ও বজ্র নির্ম্মিত। প্রতি প্রাকারই যেন এক একটি দুর্গ, সর্ব্বত্রই রক্ষক ও দুর্গপালের ব্যবস্থা আছে। লৌহ-দুর্গের রক্ষক মহাকালগণ ও তাঁহাদের শক্তি। ইঁহারা ভগবতীকে কালচক্রে উপাসনা করেন। কালচক্রটি ত্রিকোণ, পঞ্চকোণ, ষোড়শদল ও অষ্টদল কমল। অন্যান্য ছয়টি দুর্গের রক্ষক শক্তিসহ ছয়টি ঋতু। এই সকল চক্রে ত্রিশটি শক্তি কার্য্য করিতেছে—মধুশুক্লা এক হইতে পনর ও মধুকৃষ্ণা এক হইতে পনর। এখানে বহু শালা আছে যাহাতে গন্ধর্ব্ব অপ্সরা নাগ যক্ষ ও রুদ্রগণ বাস করে। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে প্রায় পঁচিশটি শালার উল্লেখ আছে। এক একটি শালা যেন এক একটি দুর্গ। বিভিন্ন শালা বিভিন্ন উপাদানে রচিত। অষ্টধাতুর একটি শালা আছে। উভয় শালার মধ্যে বৃক্ষের ঝাড় ও কুঞ্জ বিদ্যমান। যেমন সুবর্ণ ও রজত শালার মধ্যে কদম্ব-বন-বাটিকা যেখানে মন্ত্রিণী বাস করেন। এগারটি শালা মহামূল্য রত্নময়—পুষ্পরাগ, পদ্মরাগ, গোমেদ, বজ্র, বৈদূর্য্য, ইন্দ্রনীল, মুক্তা প্রভৃতি রচিত। মৌক্তিক শালাটিতে চক্র মধ্যে (যাতে ষোলটি ঘর আছে)

মহারুদ্র বাস করেন তিনিও সর্ব্বদা ভগবতীর ধ্যানে মগ্ন। তাঁহার চারিদিকে রুদ্রগণ ও রুদ্রাণীগণ ঘের করিয়া আছেন। এই সকল রুদ্রই দুর্গ রক্ষক। কেহ উপবিষ্ট, কেহ জাগ্রৎ, কেহ সুপ্ত, কেহ দণ্ডায়মান এবং কেহ ধাবমান।

২। আর একটি নগরের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় যেখানে ভগবতী ললিতা ভণ্ডাসুরের সঙ্গে যুদ্ধের পর বিশ্রাম করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধি আছে বিশ্বকর্ম্মা ও ময় এই নগর রচনা করিয়াছিলেন। যোগিসমাজে এইরূপ প্রসিদ্ধ আছে যে অগস্ত্য ঋষি মেরুস্থিত শ্রীমাতার নগর দর্শন করিতে পারেন নাই। তিনি বেদবিৎ ও সর্ব্ব-শাস্ত্র-বিশারদ হইলেও তন্ত্র-দীক্ষা রহিত ছিলেন বলিয়া পরাশক্তির নিগূঢ় উপাসনায় অনধিকারী ছিলেন। তাই উক্ত নগর দর্শন তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই। ইহা নিয়তির নিয়ন্ত্রণ। পরে দেবীর মাহাত্ম্য শুনিয়া তাঁহার প্রতি ভক্তিযুক্ত হন ও সপত্নীক সক্রম তান্ত্রিক দীক্ষালাভ করেন। ইহার পর তিনি লোপামুদ্রার সহিত উপাসনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। ইহার ফলে তিনি সস্ত্রীক গুরুমণ্ডলে উত্তম স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হন। (দ্রষ্টব্য—ত্রিপুরা রহস্য, মাহাত্ম্য খণ্ড, অধ্যায় ৭৯)।

৩। ভগবতী পূর্ব্ব সাগর তীরে কামগিরিরূপে, পশ্চিম সাগর তীরে পূর্ণগিরিরূপে ও মেরুসানুতে জালন্ধররূপে আছেন। বলা বাহুল্য, এইগুলি প্রসিদ্ধ চতুষ্পীঠের অন্তর্গত।

৪। ভাস্কর রায় তিনটি শ্রীপুরের কথা বলিয়াছেন। প্রথমটি অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে ঊর্দ্ধে অনন্ত যোজন বিস্তৃত ও পঁচিশ প্রাকার দ্বারা বেষ্টিত। দ্বিতীয়টি মেরুর উপরে

সংস্থিত, উহা প্রথমটি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত। ভগবান্ দুর্ব্বাসা ললিতা-স্তব-রত্নে ইহার বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা মেরুর মধ্য শৃঙ্গে অবস্থিত। মেরু পর্ব্বতে শিব-ত্রিকোণবৎ তিনটি শৃঙ্গ আছে। উহাদের মধ্যে চতুর্থ ত্রিকোণ আছে চারিশত যোজন উচ্চ। ইহাতেও পঁচিশটি প্রাকারের কথা আছে এবং অন্যান্য বহু বৈশিষ্ট্যের বিবরণ আছে। তৃতীয়টি ক্ষীর-সমুদ্র মধ্যে বিদ্যমান। শ্রীবিদ্যারত্ন সূত্রের ভাষ্যকার এই কথা বলেন। ইহার চতুর্ব্বিংশতি প্রাকারের উল্লেখ পাওয়া যায় (দ্রষ্টব্য—ললিতা সহস্র নাম ভাষ্য, পৃঃ ৪, ৩৯—৪০)।

রুদ্রযামলে আছে যে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে উর্দ্ধে সহস্র কোটি যোজন বিস্তীর্ণ রত্নদ্বীপ বিদ্যমান। উহার পঁচিশটি প্রাকার পঁচিশটি তত্ত্ব দ্বারা রচিত (ললিতা ভাষ্য, পৃঃ ৪০, ৪৩)। বস্তুতঃ এই রত্নদ্বীপ আমাদের পূর্ব্ববর্ণিত মণিদ্বীপেরই নামান্তর।

(৫)

এই 'মা'ই গুরুরূপে ভাবনীয়। ভাবনোপনিষদে শ্রীগুরুকে সর্ব্বকারণভূতা শক্তি বলা হইয়াছে। তন্ত্ররাজেও আছে—

"গুরুরাদ্যা ভবেৎ শক্তিঃ সা বিমর্শময়ী মতা।
নবত্বং তস্য দেহস্য রন্ধ্রত্বেন বিভাসতে॥"

এই নবরন্ধ্রই দেহের প্রসিদ্ধ নব দ্বার। এই নব দ্বারের মধ্যে দুইটি শ্রোত্র ও বাক্ এই তিনটি দিব্যৌঘ. দুইটি চক্ষু ও উপস্থ এই তিনটি সিদ্ধৌঘ এবং দুইটি নাসা ও পায়ু এই তিনটি মানবৌঘ। দেহের এই নয়টি রন্ধ্রই নবনাথের স্বরূপ। শিবসূত্র-

বার্ত্তিকেও পরমেশ্বরের অনুগ্রহাত্মিকা পরা শক্তিকেই গুরু বলা হইয়াছে। সুতরাং মা ও গুরু অভিন্ন।

(৬)

এবার ভগবতীর প্রধান অপর রূপ ও পররূপের মধ্যে কি প্রকার সম্বন্ধ তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। অপ্রধান অপর রূপের প্রসঙ্গ এখানে উঠাইব না, কারণ জগতের সব রূপই ত তাঁহারই রূপ। যেটি প্রধান অপর রূপ তাহাই সৃষ্টির আদি ও বিশ্বের শিখরদেশে অবস্থিত। ইহাই শিব-শক্তির যুগল রূপ। এই শক্তিকে আপাততঃ আমরা পঞ্চদশী বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। এই যুগল রূপই অনাদি দিব্য-মিথুন রূপে সাধক সমাজে পরিচিত। শ্রীচক্রের সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরতম চক্রের নাম বৈন্দব চক্র—মধ্য ত্রিকোণের অভ্যন্তরে নিত্যামণ্ডল অর্থাৎ পঞ্চদশ কলা-বেষ্টিত মহাবিন্দু।* বস্তুতঃ পনরটি নিত্যার সাম্যাবস্থার নামই

---

* চন্দ্রমণ্ডলে ষোল কলা। এই ষোল কলার মধ্যে পনরটি কলা বেষ্টনাকারে চারিদিকে রহিয়াছে। মধ্যের কলাটির নাম সাদাখ্য—ইহাই ষোড়শী। এই পনর কলাই পনর তিথি। কামেশ্বরী হইতে চিত্রা পর্য্যন্ত পনরটি নিত্যা ইহারাই। সাদাখ্য কলা=ললিতা। এই কালচক্র বা তিথিচক্র সর্ব্বদা আবর্ত্তিত হইতেছে—ইহার ভিতরে শ্রীচক্র। (দ্র—ভাবনোপনিষদ ও ভাস্কর ভাষ্য ৩৩ সূত্র পৃঃ ৭৩৭—৭৩৮)। ইহার তাৎপর্য্য এই, কালরূপ প্রপঞ্চের মধ্যেই শ্রীচক্র বিদ্যমান। দেশরূপ প্রপঞ্চের মধ্যেও শ্রীচক্র রহিয়াছে। ভূগোলের উত্তর ভাগে মেরু, তাহার দক্ষিণে জম্বু প্রভৃতি সাতটি দ্বীপ, তাহাদের অন্তরালে ভূগোলের বলয়াকার সপ্ত সমুদ্র। পুষ্কর দ্বীপের ঘের মধুর জল বিশিষ্ট সমুদ্র। তাহার দক্ষিণে

বিন্দু। এই বিন্দুকে বেষ্টন করিয়া তাহার ঘের রূপে পনরটি নিত্যা বিদ্যমান। এই সকল নিত্যা প্রতিপদাদি পনরটি তিথির প্রতীক। সুতরাং এই নিত্যা মণ্ডল এক হিসাবে কালচক্রেরই প্রতিনিধি। সাধনের ক্রমবিকাশে একটি নিত্যা অপর নিত্যাকে লীন করিয়া প্রদক্ষিণ ক্রমে অন্তিম নিত্যার লয় সাধন পুর্ব্বক আবর্ত্তন সমাপ্ত করে। মনে রাখিতে হইবে একটি নিত্যা অপর নিত্যাতে স্বয়ং লীন হয় না এবং উদ্বৃত্ত শক্তির দ্বারা তাহাকেও নিজের মধ্যে লীন করে না, বরং অপর নিত্যার স্বরূপে উন্নীত হইয়া অগ্রসর হয়; তাই কর্ম্ম চলিতে থাকে এবং সর্ব্ব-সমাধানের পরও উদ্বৃত্ত শক্তি দ্বারা বিন্দুতে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়। স্বয়ং লীন হইয়া গেলে ইহা সম্ভবপর হইত না। কালচক্রের আবর্ত্তনই কর্ম্ম বা উপাসনার প্রকৃত স্বরূপ। আবর্ত্তন পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিন্দুতে প্রবেশ ঘটে। ইহাই পঞ্চদশী প্রাপ্তি। পঞ্চদশী সিদ্ধ হইলে আবর্ত্তন থাকে না। অর্থাৎ যুগলকে প্রাপ্ত হইলে কুঞ্জ-লীলার অবসান হইয়া যায়, বৈষ্ণব সাধনার এই লীলা-রহস্য এই সত্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত।

—পরব্যোম। মেরু হইতে ব্যোম পর্য্যন্ত ষোল স্থানে ললিতা হইতে চিত্রা পর্য্যন্ত ষোলটি নিত্যা যুগ প্রথম বর্ষে স্থিত, দ্বিতীয় বর্ষে জম্বু দ্বীপ হইতে মেরু পর্য্যন্ত গমন করে, তৃতীয় বর্ষে লবণ সমুদ্র হইতে জম্বু দ্বীপ পর্য্যন্ত গমন করে। এই ষোড়শ বর্ষে পরব্যোম হইতে মধুর সমুদ্র পর্য্যন্ত ললিতাদি ষোড়শ নিত্যা অবস্থিত। এই ভাবে ষোল ষোল বৎসরে নিত্যাগণের এক একটি আবর্ত্তন সংগঠিত হয়। শ্রীচক্র এই দেশরূপ চক্রের অন্তরে, বাহিরে নহে।

কিন্তু পঞ্চদশী যুগল রূপ। এই যুগল রূপ হইতে ক্রমশঃ অদ্বয় স্বরূপে যাওয়াই গুহ্য সাধনার ইতিহাস। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে পঞ্চদশী হইতে ষোড়শী পর্য্যন্ত বিবর্ত্তন আবশ্যক। এই যে যুগল রূপের কথা বলা হইল উহাতে পরমা প্রকৃতি পরম পুরুষের অঙ্কগতা এবং উভয়েই চতুর্ভুজ। পঞ্চদশী হইতে ষোড়শীতে যাইতে হইলে শিব-শক্তির সম্বন্ধ ক্রমশঃ অন্যরূপ ধারণ করে। শক্তি শিবে আশ্রিত ইহাই পঞ্চদশীর স্বরূপ, কিন্তু যতক্ষণ শক্তি শিবের আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া শিবকে শবরূপে অথবা অন্ততঃ সুপ্তরূপে রক্ষা করিয়া শিব হইতে উর্দ্ধমুখে উদ্গত না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত পঞ্চদশী হইতে ষোড়শীতে যাওয়ার কোন আশাই নাই। পঞ্চদশী কালচক্রের অতীত ইহা সত্য, কিন্তু অতীত হইয়াও বস্তুতঃ অতীত নহে। কারণ পঞ্চদশীতে বিন্দুর আপূরণ ও সংক্ষয় উভয়ই বিদ্যমান রহিয়াছে। পূর্ণিমা বা অমাবস্যা কোনটিই স্থায়ী নহে, কারণ পূর্ণিমার পর কলা-ক্ষয় হয় এবং অমাবস্যার পর কলার বৃদ্ধি হয়। যাহার বৃদ্ধি ও হ্রাস হয় তাহা অপূর্ণ; যাহা প্রকৃতই পূর্ণ তাহার বৃদ্ধিও নাই, হ্রাসও নাই, তাহাই ষোড়শী, তাহাই অমৃত কলা।

"পুরুষে ষোড়শকলেঽস্মিন্ তামাহুরমৃতাং কলাম্।"

এই ষোড়শী অমৃত কলা—ইহাই মৃত্যুর অতীত, পরিবর্ত্তনের অতীত ও কালের অতীত। পঞ্চদশী বিন্দুরূপে কালের আবর্ত্তন হইতে মুক্ত হইয়াও প্রকৃত মুক্ত নহেন। শিব শক্তিকে অঙ্কে ধারণ করিয়াছেন ইহা যোগের একটি অবস্থা। ষট্‌চক্র ভেদ হইলে সহস্রদল কমলের বিন্দুতে এই অবস্থার উদয় হয়। এই

স্থলে শক্তি পঞ্চদশী অবস্থার অন্তর্গত। কিন্তু শক্তি ষোড়শী অবস্থা তখনই প্রাপ্ত হইতে পারে যখন শিব পরমশিবরূপে তাঁহাকে ধারণ করিবার যোগ্যতা লাভ করেন।

শক্তি শিবের অঙ্ক হইতে অবতীর্ণ হইয়া ক্রমশঃ অধিকতর পুষ্টি লাভ করিলে নাভি-মার্গ উন্মুক্ত হয় এবং পুষ্টির প্রকর্ষাবস্থায় নাভি মার্গ হইতে নির্গত ব্রহ্মনালকে আশ্রয় করিয়া যে কমল শূন্যপথে বিকশিত হয় তাহাতে স্থিতিলাভ করেন। এদিকে শিব পরমশিবরূপে উন্নীত হন। যে চারিটি অন্তরালবর্ত্তী অবস্থার কথা বলা হইয়াছে তাহাদের নাম ক্রমশঃ এই প্রকার :—

১। প্রাসাদ। এই অবস্থায় পরম পুরুষ ও পরমা প্রকৃতি তল্পে শয়ান। ইহা একপার্শ্বগত স্থিতি।

২। মহাপ্রাসাদ। এই অবস্থায় পুরুষ ও প্রকৃতিতে পরস্পর মিলন মুদ্রার পূর্ব্বাভাস।

৩। পরা প্রাসাদ। ইহা সামান্য মিলন-মুদ্রার অবস্থা।

৪। প্রাসাদ পরা। ইহা বিপরীত মিলনের অবস্থা।

ইহার পরেই ষোড়শী। তখন শিব আর শিব নাই। পূর্ব্ববর্ণিত চারিটি আসনের প্রভাবে শিব শববৎ সুপ্ত অবস্থায় পরিণত এবং চৈতন্য বা শক্তি নাভিদ্বারে বহির্গত হইয়া প্রকাশমান। শক্তি তখন একেলা। শিব তখন জড়। ঐ উন্মুক্ত শক্তিই তাঁহার অধিষ্ঠাত্রী।

ষোড়শীর পরাবস্থাই পরা। মহাশক্তি তখন দ্বিভুজা ও সুবর্ণ পীঠে অধিরূঢ়া। অগ্রে ও পৃষ্ঠে উভয়দিকেই জাগৃতি। পঞ্চদশী হইতে ষোড়শী পর্য্যন্ত শক্তি ছিলেন রক্তবর্ণা, এবার

তিনি শুক্লবর্ণ ধারণ করিয়াছেন—রক্তবর্ণ আর নাই। ইহার পর মহাপাদুকা*—তাহাই চরণ। ষোড়শী ও মহাপাদুকার অন্তরালে ঘোর নাদ বিদ্যমান আছে। ইহাই পর-নাদ। মহাপাদুকার নখ হইতে পরমামৃত নিঃসৃত হইয়া সমগ্র জগৎকে

---

* এই মহাপাদুকা প্রসঙ্গে গুহ্য উপাসনা সংক্রান্ত যোগ-সাহিত্যে বহু গভীর তত্ত্বের আলোচনা আছে। এইস্থানে তাহার অবতারণা অনাবশ্যক। যোগরত্নাবলী নামক একখানা হস্তলিখিত পুস্তক নেপাল হইতে আনীত হইয়াছিল ও আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছিল। উহাতে যে ক্রমের নির্দ্দেশ আছে তদনুসারে ব্রহ্মরন্ধ্রে পূর্ব্ব-বর্ণিত শিবশক্তি যুগলের স্থান দেখা যায়। তারপর ঊর্দ্ধ চক্রে পরা প্রাসাদ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। নিরোধিকাতে লক্ষিত হয় মহাপাদুকা। ইহার পর নাদ ও উন্মনা অবস্থা। তাহার পর শিবাবস্থা। শিবাবস্থার পর নির্ব্বাণ। এই নির্ব্বাণের মধ্যেও একটা ক্রম আছে—এই ক্রমের পরিসমাপ্তি যেখানে সেইখানেই চরম নির্ব্বাণ। তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে অখণ্ড মহাশূন্য নির্ব্বাণ। যোগরত্নাবলীর ধারা হইতে মনে হয় চক্ষু জীবাত্মার স্থান ও ইচ্ছাশক্তির অধিষ্ঠান। তারপর ত্রিকুটী বা আহ্লাদ চক্র। সেখানে ইচ্ছা নাই আর জীবভাবও নাই, কিন্তু আনন্দ আছে। ব্রহ্মরন্ধ্রে শুদ্ধ শক্তিভাব আছে—তাই শিবভাব স্ফুরিত হইয়াছে—শিব ও শক্তি যুগল। ব্রহ্মরন্ধ্রের পর আর শক্তি নাই, ক্রমশঃ শিব ভাবেরই প্রকর্ষ চলে। উহা বিশুদ্ধ শিবভাব নহে, কারণ তখনও মন রহিয়াছে। মনকে সরাইবার পথে প্রথমে ঊর্দ্ধচক্রে পরা প্রাসাদ, তারপর নিরোধিকাতে মহাপাদুকা, তদনন্তর নাদ হইতে উন্মনা পর্য্যন্ত। উন্মনাতে মন নাই বলিয়া শিবভাব বিশুদ্ধ, তাই সঙ্গে সঙ্গেই নির্ব্বাণের উদয়। ক্রমশঃ নির্ব্বাণ গভীর হইতে গভীরতর হইতে লাগিল, তাহার ফলে শিবভাবও শূন্য হইয়া গেল। ইহাই মহাশূন্য নির্ব্বাণ, ইহাই নিষ্কল পদ।

প্লাবিত করিতেছে। মহাপাতুকার পরে আর কিছুই নাই—আছে একমাত্র সেই অখণ্ড মহাপ্রকাশ। বস্তুতঃ সেই মহাপ্রকাশে প্রবিষ্ট হইবার দ্বারই এই মহাপাতুকা।

(৭)

সমস্ত বিশ্বই চক্র-স্বরূপ। ইহাই শ্রীচক্র। বিন্দু হইতে ইহার আবির্ভাব হয়, আবার বিন্দুতেই ইহার লয় হয়। আবির্ভাবের ক্রম আছে। প্রথমে বিন্দু রেখাতে পরিণত হয় । বস্তুতঃ সরলরেখাই মূল রেখা—বায়ুর বক্র গতিতে এই সরলরেখা বিভিন্ন প্রকার বক্র রেখায় পরিণত হয়। রেখার সংযোগে আয়তন হয়—তাহাদেরও আবার সংযোগ হয়। মোটের উপর বিন্দুর প্রসার হইতেই অনন্ত প্রকার চক্রের উদ্ভব হইয়া থাকে। চক্রের সৃষ্টিও যা আর বিশ্ব বা দেহের সৃষ্টিও তাই। প্রতি দেবতাই স্বরূপতঃ চিদাত্মক—শুধু ভাবের ভেদে ভেদাভাস জাগে, ভাবভেদ হইতেই চক্রভেদও হইয়া থাকে। যাহাকে শ্রীচক্র বলা হয় তাহাও ভাবেরই একটি বিশিষ্ট সংস্থান।

বিন্দুই চক্রের মূল। শিব ও শক্তির সামরস্যকে বিন্দু বলে—ইহার নাম রবি অথবা কাম। শিবাংশ সংহারাত্মক অগ্নি এবং শক্ত্যংশ সর্গাত্মক সোম—বিন্দু উভয়ের সামরস্য বা রবি। ইহা স্থিতি রূপ।

আদ্যাশক্তি সর্ব্বতত্ত্বময়ী প্রপঞ্চ রূপা, অথচ সর্ব্ব তত্ত্বের অতীত। তিনি নিত্য পরমানন্দ রূপ ও চরাচরের বীজ স্বরূপ। অহং শিবের স্বরূপ, অহমাকার জ্ঞান বিমর্শ বা শক্তির স্বরূপ। আদ্যাশক্তিই শিবের স্বরূপ-জ্ঞান প্রকাশের পক্ষে নির্ম্মল দর্পণ-

স্থানীয়। অহংজ্ঞানই শিবের স্বরূপ-জ্ঞান—আত্মাশক্তিতেই তাহার প্রকাশ হয়। আগমবিদ্‌গণ বলেন, যেমন একজন সুন্দর রাজা স্বাভিমুখে স্থিত স্বচ্ছ দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়া ঐ প্রতিবিম্বকে অহং বলিয়া জানিতে পারে তদ্রূপ পরমেশ্বর নিজের অধীন স্বাত্মশক্তিকে দর্শন করিয়া নিজের স্বরূপ জানিতে পারেন। "আমি পূর্ণ", ইহাই সেই জ্ঞানের স্বরূপ। দর্পণ যেমন সন্নিহিত বস্তুর সম্বন্ধ ব্যতীত নিজের অন্তর্গত প্রতিবিম্ব অবভাসিত করিতে পারে না, তদ্রূপ পরা শক্তিও পরম শিবের সম্বন্ধ ব্যতীত নিজের অন্তঃস্থিত প্রপঞ্চ প্রকটিত করিতে পারেন না। তাই কেবল শিব বা কেবল শক্তি দ্বারা জগতের নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পন্ন হয় না— উভয়ের সহকারিতা চাই। উভয়ের সম্বন্ধ হইতেই সকল তত্ত্বের উদয় হয়। সুতরাং এক হিসাবে চক্রের অবতরণ বিষয়ে কাহারও প্রাধান্য আছে বলা চলে না। সেইজন্য সাংখ্যায়ন শাখাতে কাম ও কামেশ্বরীর সমপ্রধানত্ব বর্ণিত হইয়াছে। বস্তুতঃ শিব ও শক্তি একই তত্ত্ব—"শিবশক্তিরিতি হ্যেকং তত্ত্বমাহুর্মনীষিণঃ।" তথাপি চক্রাবতারে শক্তিরই প্রাধান্য অঙ্গীকৃত হয়। যখন সেই পরাশক্তি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিশ্ব সৃষ্টি করেন তখন চক্র সম্ভূত হয়— যে বিশ্ব তাঁহারই মধ্যে অব্যক্ত ভাবে নিহিত ছিল তাহা তখন ফুটিয়া উঠে। পরা শক্তিতে সৃষ্টির ইচ্ছার জাগরণ প্রাণিগণের অদৃষ্টগত বিপাকবশতঃ হইয়া থাকে। পরা শক্তির বিশ্বরূপ ধারণ করাই বিশ্বের সৃষ্টি। ইহাই তাঁহার স্ফুরত্তা। এই সৃষ্টি-ব্যাপারে শিব থাকেন তটস্থ বা উদাসীন। তত্ত্ব সকলের সমষ্টিকেই বিশ্ব বলা হয়। শ্রীচক্র এবং অন্যান্য চক্র তত্ত্ব-সকলেরই

সংস্থান ব্যতীত অন্য কিছু নহে—ইহা তত্ত্বাতীত অবস্থা হইতে প্রকটিত হয়। তত্ত্বাতীত সত্তা শান্ত শিব ও নিষ্ক্রিয়। তাহা হইতে তত্ত্বময় চক্র কি প্রকারে আবির্ভূত হয় ? এইখানেই পরা শক্তির আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম হইবে। পরা শক্তির ইচ্ছাই সৃষ্টির মূল। তাই চক্রাবতারে শক্তির প্রাধান্য অঙ্গীকার করিতে হয়।

অতএব পরাশক্তি একদিকে এবং উহার স্ফুরত্তা অপর দিকে। স্ফুরত্তাই সৃষ্টির রূপ। সর্ব্বতত্ত্বময় বিশ্বের সৃষ্টি, বিশ্বময় পরদেবতা চক্রের আবির্ভাব ও পরা শক্তি কর্ত্তৃক স্বীয় স্ফুরত্তার দর্শন একই কথা।

এই আবির্ভাবে স্বরূপতঃ ক্রম না থাকিলেও বুদ্ধির দিক্ দিয়া একটি ক্রম যে প্রকারেই হউক স্বীকার করিতে হয়। এই ক্রমটি আমাদের বর্ত্তমান দৃষ্টিকোণ হইতে নিম্নলিখিত রূপে প্রদর্শন করা যায় :—

১। তত্ত্বাতীত প্রকাশ বা শিব। ইহা নিরাকার ও শূন্য রূপ, অ।

২। দ্বিতীয় অবস্থা শিব-শক্তির সামরস্য। ইহা কাম বা রবি। ইহা অগ্নীষোমাত্মক বিন্দু। শিব = অ ও শক্তি = হ। উভয়ের সামরস্যই এই বিন্দু।

৩। তারপর বিন্দুর স্পন্দন বা সংসরণ—ইহারই নাম শুক্লবিন্দু ও রক্তবিন্দু।

৪। পূর্ব্ব কথিত সংসরণ হইতে যাহা অভিব্যক্ত হয় তাহার নাম সংবিৎ। ইহা চিন্ময়ী ও অগ্নীষোমাত্মিকা।—ইহার

নাম চিৎকলা। অগ্নি-সম্পর্কে যেমন ঘৃত বিগলিত হইয়া বহিতে থাকে তদ্রূপ প্রকাশের সম্বন্ধ বশতঃ পরাশক্তি বা বিমর্শের স্রাব হয়। স্রাব হইলেই লহরী বা তরঙ্গ উঠিয়া থাকে—উহাই উভয় বিন্দুর অন্তরালস্থ হার্ধ কলা।

৫। এই হার্ধ কলাযুক্ত প্রকাশ হইতেই বৈন্দব চক্রের প্রসর হয়। উক্ত প্রকাশকেই কামকলাক্ষর বলে। অতএব বিন্দু হইতেই বৈন্দব চক্র হয় বটে, কিন্তু বিন্দুতে স্পন্দন হওয়া চাই। এই বৈন্দব চক্রই মধ্য ত্রিকোণ অর্থাৎ বিশ্ব-জননীর নিজ স্থান, যাহা হইতে সমগ্র বিশ্বের আবির্ভাব ক্রমশঃ ঘটিয়া থাকে।

নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্রের প্রথম পরিণামই কামকলারূপ—ইহাই মহাশক্তি মার আবির্ভাব। ইহার পর তাঁহার পট্টাভিষেক অর্থাৎ সকল ভুবন-সাম্রাজ্যের অধিকার বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য লাভ (ললিতা সহস্র নাম ভাষ্য)।

যে বিন্দু হইতে বৈন্দব চক্র উৎপন্ন হয় তাহাই পরমাত্মা—তাহাই মহাবিন্দু বা সদাশিব। এই বিন্দুটি বস্তুতঃ পশ্যন্তী মধ্যমা ও বৈখরী এই তিন মাতৃকার সমষ্টি বা তুরীয় বিন্দু। ইহাকে কেন্দ্র করিয়া মূল ত্রিকোণ প্রসৃত হয়, এইজন্য এই ত্রিকোণকে ত্রিমাতৃকাময় ও ত্রিমাতৃকারচিত বলা হয়। মহাবিন্দুতে ত্রিমাতৃকা এক বিন্দুরূপে একীভূত। বৈন্দব চক্রে তাহারা প্রসৃত হইয়া পরস্পর পৃথক্ ভাব গ্রহণ পূর্ব্বক তিনটি রেখা ভাব প্রাপ্ত হইয়া পরস্পর সম্বন্ধ হওয়ার ফলে ত্রিকোণরূপে পরিণত হয়। ইহাই বিশ্বযোনি—যাবতীয় তত্ত্ব অর্থাৎ ছত্রিশ তত্ত্বই ইহার লহরী-

স্বরূপ। এই সকল তত্ত্ব বা সমগ্র বিশ্ব বৈন্দব চক্র হইতেই উদ্ভূত হয়। বৈন্দব চক্র কামকলাক্ষর দ্বারা গঠিত। সুতরাং সকল তত্ত্ব ও চক্রই মূলে কামকলাময় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

—ক্রমশঃ

জ্ঞানগঞ্জের পত্রাবলী

মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, এম-এ, ডি-লিট্

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

নবম পত্র

ওঁ তৎসৎ

১৮৩৪।৪ শুক্লপক্ষ
পাঞ্জাব, জ্ঞানগঞ্জ আশ্রম।

নারায়ণ স্মরণবরেষু,

পরমহংস জ্ঞানানন্দ স্বামীর শুভ সংবাদে যথাবিধানে সম্ভাষণ পূর্ব্বক বিজ্ঞাপন পরম্—

ভাই বিশুদ্ধানন্দ, তোমার প্রেরিত শুভ সংবাদে পরম আনন্দ লাভ করিলাম। ভাই, সংসার-সমুদ্র বিশাল, বিরাট্, অনন্তের অনন্ত জলরাশি, দিক্‌শূন্য প্রবল তরঙ্গ, আবার ধীর, স্থির ও গম্ভীর। আবার কখন তরঙ্গ, কখন তরঙ্গ নাই, গর্জ্জন নাই, ভীম-ভৈরব নর্ত্তন নাই, আছে কেবল আশাশূন্য আশাদায়ক শব্দ। চন্দ্রালোকজনিত স্ফীতি, মধুর মিলনে সুধা ও গরল বা প্রাকৃতিক আকর্ষণে বিকৃতি ভাবের ভাবে সিন্ধুজল কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, চলিতেছে, পড়িতেছে, কোথাও কোথাও বা ধীর তরঙ্গ-ভঙ্গ হইতেছে। কোথাও বা বিন্দুমাত্র আশা, সিন্ধুর ন্যায় আশাশূন্য; কোথাও বা সিন্ধুর ন্যায় আশা, নিরাশা

বিন্দুমাত্র। প্রকৃতির বিকৃতি-ভাব এখানে নাই। রম্য নিকেতনে সাম্যভাব অনেকে স্বভাবে (?) সে ভাবের শোভাঙ্গ সঙ্গমস্থলে বিক্ষিপ্ত মনের ভাঙ্গা-গড়ার কল্পনায় গুণ ডুবাইয়া ভাব লইয়া ভাবুক উপস্থিত। হাসা চাঁদ ফাঁদে পড়ে চিরদিন হাসে। হাসা অরুণের বর্ণ বিবর্ণ, সোহাগ-শূন্য কিনা। ডুবি ডুবি করিতেছে। সম্মুখে সীমাশূন্য বারি অরিশূন্য হইয়া গা এলাইয়া চক্ষু বুজিয়া জগৎ-প্রকাশকের মহিমা প্রকাশ করিতেছে। কুলে এলেই আত্মহারা, নারায়ণের কৃপায় সীমাশূন্যের সীমা হয়। শক্তিশূন্য হইলে নারায়ণও আত্মহারা হয়েন, তাহার নিশানা আমরা তাঁহারা এবং জগৎ। সবই ত জান, বেশ আছ, তোমার ন্যায় যথার্থ পুরুষেরই সংসারে থাকা কর্ত্তব্য। মহাত্মা মহাপুরুষ ভগবান্ পরমারাধ্য দাদা গুরুদেব শ্রীমৎ ভৃগুরাম পরমহংসদেব তোমার বিষয় কত যে বলিলেন তাহা বর্ণনাতীত। তুমিই যথার্থ ভক্ত, মহাপুরুষ, যোগী, জ্ঞানী, ত্যাগী ও গৃহী। অসীম সহ্যগুণ অথচ ভোগী। দাদা গুরুদেব একদিন সকল যোগীকেই তোমার অসীম যোগের বিষয় দেখাইলেন, এখনও যে উগ্র তপস্যা করিতেছ তাহাও দেখাইলেন। ফিরে দেখি কিছুই নাই, চকিতে অন্তর্হিত। দেহ কণ্টকিত হইল, পুনঃ দেখি জগত নাই, আমিও নাই। একি খেলা ভাই! তাই জিজ্ঞাসা করি জীবের অতীত বয়ঃক্রম হইল, অনেক ম্লেচ্ছ, হিন্দু, মুসলমান শিষ্য করিয়াছি, অনেক দেখিলাম, অনেক করিলাম, তোমার ন্যায় যোগশিক্ষা পরমারাধ্য ভৃগুরাম স্বামী আমায় দিলেন না। আমার ইচ্ছা তোমার নিকট কিছুদিন থাকিয়া চাত্বর এবং যাগ-কল্প

যোগ শিক্ষা করি, ইহাতে অভিপ্রায় কি? জীবে শিবে পার্থক্য নাই, তবু মানে না। মঙ্গলময়ের রাজ্যে জীব যৌবনাবস্থাতে কাম-ক্রোধাদি অধীন হইয়া পাপ-পুণ্যাত্মক বিবিধ কর্ম্ম আচরণ করে। আচ্ছা! জীব দেহের ভোগার্থই কর্ম্ম জাল আচরণ করে। দেহ আত্মা হইতে বিভিন্ন, আত্মা ত কিছুই ভোগ করেন না, যদি করেন তাহা হইলে পাপ-পুণ্যের ভাগী কে? এতে তোমার মত কি ভাই? ব্রহ্মচারী প্রায় নয়শত হইতে পরীক্ষা করিতে হইবে। এই চতুর্থ মঠের মত। তোমাকেই সকলে স্বস্তি করিয়াছেন। বোধ হয় শীঘ্রই তোমাকে পাঞ্জাব আসিতে অনুমতি করিবেন। ভৈরবী মাতাদের কুয়া যাহা ....করিয়া দিবে তাহাতে কাটাই খরচ বারশত টাকা হইবে, বাঁধাই প্রভৃতি আলাহিদা লাগিবে। ভৈরবী মাতা তাহার জন্য যে ক্রিয়া করিয়াছেন তাহাতেই তাহার যথেষ্ট হইয়াছে, ও তাহার বাড়ীর জন্য যাহা করিয়াছেন তাহাতে তাহাদের শুভ। তাহার জীবন রক্ষা হইয়াছে এবং অন্যান্য বিষয় শুভ হইবে। ইহা অপেক্ষা তাহার পক্ষে তাহার শুভের বিষয় আর কি হইতে পারে? ....তোমার একজন ভক্ত। সেইজন্যই তাহার জন্য ভৈরবী মাতারা দুই একটি ক্রিয়া করেন এবং করিয়াছেন। অষ্টমে রাহু প্রযুক্ত তাহার স্ত্রীর শরীর উপস্থিত সুস্থ থাকিবে না। ......র বিষয়—এখন তাহার গ্রহ বিরুদ্ধ, পরে তিনি লিখিবেন। বর্দ্ধমান শিষ্যদের সম্বন্ধে শীঘ্রই তিনি লিখিবেন। বর্ত্তমান বর্দ্ধমান আশ্রমে তোমার থাকা সন্দেহ। আশ্রমের নিকটে ক্ষুদ্র গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া কিম্বা আশ্রমের শিখর-দেশে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া

থাকিতে আদেশ করিবেন। চারিটি ব্রহ্মচারী ও চারিটি সন্ন্যাসী থাকিবেন। বর্দ্ধমান আশ্রমের বন্দোবস্ত ত্রিপুরা ভৈরবী মাতা করিবেন। তাঁহার অবস্থায় তুমি তথায় থাকিতে পাইবে না। আশ্রমের নিকটেই ক্ষুদ্র গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী সহ থাকিবে। ....র বিষয় যাহা লিখিয়াছ তাহার বিষয় সমস্ত পরে লেখা হইবে। অন্যান্য সমস্ত বিষয় পরে লিখিব। এই পত্রের নকল করিয়া চন্দ্রনাথ শ্যামানন্দ স্বামীকে পাঠাইবে। ভাই শ্যামানন্দ, তুমি বিশুদ্ধানন্দের সহিত একবার সাক্ষাৎ করিবে। পূর্ব্বে যে বিষয়ে লেখা হইয়াছিল, তাহার সাঙ্কেতিক চিহ্ন দেখাইয়া তাহার নিকট প্রকাশ করিয়া লিখিত মত কার্য্য করিবে। এ বিষয়ে তাচ্ছিল্য করিবে না, করিলে কি হয় তাহা বিশেষ জান। কলিকাতার............এর বিষয় যাহা লিখিয়াছিলে তাহার উপস্থিত ভাল কই? তাহার সকল বিষয়ই উপস্থিত খারাপ হইবে। পরে সুবিধা হইতে পারে। ত্রিপুরা ভৈরবী এই কথা বলিয়াছেন। তাহার ভাদ্রবধূর সহিত যাহা দ্বন্দ্ব হইবে সে দ্বন্দ্ব বৃথা সে না করে। বালিকার সহিত দ্বন্দ্ব করা অতীব অকর্ত্তব্য। .....পেটের অসুখের মত হইতে পারে। শীঘ্র সারিবে। তাহার ক্রিয়া ভাল হইতেছে। তাহার স্ত্রীর সম্বন্ধে যাহা করা কর্ত্তব্য তাহা জ্ঞান ভৈরবী মাতা করিবেন। এখন আমি আসি।—

শ্রীগুরুলীলা স্মরণ

শ্রীকমলাবালা দত্ত

বাবা, তোমার লীলা লেখার ক্ষমতা আমাদের নেই— তোমার লীলা লেখার ভার ও প্রকাশ করার ভার নিয়েছেন মহামান্য গোপীনাথ দাদা। তাঁর অনুগ্রহে এখন আবার সকলের নূতন অনুভূতি জাগছে। আমাদের জীবনে অনেক কিছু অনুভব এসেছিল। দুই একটি ঘটনা দিলাম।

একবার পূজার সময় আমরা সকলে কাশী যাই। আমরা অবশ্য অন্য বাড়ী ছিলাম, কিন্তু রোজ সকালে আশ্রমে যাইয়া বাবার চরণ দর্শন করিয়া বাড়ী আসিয়া ভোজন করিতাম। এক দিন বাবার দালানে আমরা সকলে বসিলাম। সেখানে অনেক ভাই-ভগিনী ছিলেন তার মধ্যে অক্ষয় দাদা, ওঁর স্ত্রী, কন্যা ও কেদার দাদা ছিলেন। আমার কন্যা অরুণাকে বাবা খুবই স্নেহ করিতেন। অরুণার হাতে একটি জবার কুঁড়ি ছিল, সেটা বাবা তার হাত হতে নিয়ে নাড়া চাড়া করতে লাগলেন। পরক্ষণেই বল্লেন, "এটা এখুনি একটা পলা হবে, কিন্তু বাপু কুমারী খাওয়াতে হবে।" সকলেই চুপ। তখন আমি বললাম, "বাবা, কত খরচ হবে?" বাবা মধুর হাসি হাসতে হাসতে বল্লেন, "পঞ্চাশ টাকা দেবে নাকি গো?" আমি বল্লাম, "আপনার টাকা, আপনি বলেন ত আমি নিশ্চয় দিতে পারবো।" তাই শুনে তিনি হাসতে

হাসতে সকলকে দেখালেন একটি নরম পলা এবং বল্লেন, "একটু রশ্মি দিলে এটা শক্ত আকার ধারণ করবে।" এই বলিয়া নাড়াচাড়া করিয়া সকলের হাতে দিলেন। দেখা গেল বেশ শক্ত হয়ে গেছে। আমি বলিলাম, "বাবা, একটা ফুটো থাক্‌লে হাতে পরা যেত।" তাই শুনে বাবা বল্লেন, "বেশ গো, তুমিই এটা পরে থেকো।" সেই পলা এখনও আমার হাতে আছে। এ রকম পলা কোথাও আজ পর্য্যন্ত চোখে পড়ে নি। বাবা, তোমায় শতকোটি প্রণাম।

আর একটি ঘটনা। শ্রীশ্রীবাবা তখন রূপনারায়ণ নন্দন লেনে থাক্‌তেন। আমরা বাগবাজার থেকে রোজ দুপুরে তাঁর চরণ দর্শনের জন্য যেতাম। যদি কোন দিন কোন কারণে যাওয়া না হত মনে শান্তি পেতাম না। সেদিনও দুপুরে গেছি। যেতেই বাবা তখুনি মেয়েদের ঘরে এলেন, এসে বল্লেন, "তোমার সন্দেশ আর মোরব্বা (পেঁপের) এত সুন্দর হয়, তা যেন মুখে লেগেই থাকে।" আমি শুনে বল্লাম, "এত দয়া আপনি করেন, তাই ভাল লাগে। আমার ত কোন গুণ নেই।" বাবা বল্লেন, "না গো, সত্যিই বড় সুন্দর।" আর যাঁরা ছিলেন তাঁদেরকেও বল্লেন, "কি গো, বল না সত্যি কিনা।" এই রকম নানা কথা হওয়ার পর বল্লেন, "এই যে বেনজয়েন ঔষধ এর গন্ধ কি তীব্র, কিন্তু এটা এখুনি এত সুন্দর গন্ধ হবে তা তোমরা অনুভব করতে পারবে না।" এই কথা বল্‌তে বল্‌তেই ধূপ-ধূনো-আতর মিশানো সুন্দর গন্ধে ঘর ভরে গেল। বাবা আমার স্বামীকে (সত্যগোপাল) ডাক্‌তে বল্লেন। তিনি আসিয়া বসিলে পর

বলিলেন, "দেখ কি সুন্দর গন্ধ, ইহাতে আবার আগের গন্ধ ফিরে আস্‌বে।" তখনি ঔষধের গন্ধে ঘর ভরে গেল। হঠাৎ বাবা দাঁড়িয়ে চম্‌কে উঠে বল্লেন, "তোমাদের কি গাড়ী আছে ?" আমি বল্লাম "না ত।" বাবা কিছু না ব'লে বারান্দায় এসেই পরমেশ্বর ভৃত্যকে ডেকে গাড়ী আনতে বল্লেন। তাঁর ঐ রকম ব্যস্ততা দেখে আমরা কিছু জিজ্ঞাসা করার সাহস পেলাম না, শুধু হতভম্ব হয়ে বসে রইলাম। বাবা বাহিরে দাঁড়িয়ে রইলেন। আশ্চর্য্য, গাড়ীও সেই মুহূর্ত্তে এসে গেল, যেন আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। গাড়ী আস্‌তেই বাবা বল্লেন, "শীগ্‌গির বাড়ী যাও, কিছু প্রশ্ন করো না।" আমরাও নানা চিন্তা নিয়ে বাড়ী ঢুকলাম। ওপরে এসে দেখি, খাটের ওপর অরুণা (আমার কন্যা) শুয়ে আছে, ডাক্তার বসে আছে। হাতের ওপর বঁটী পড়ে হাত কেটে হাড় বেরিয়ে গেছে। কেউ সে হাত ধর্‌তে পারছে না এবং ডাক্তার সেলাই করতে পারছে না। আমি দেখেই শিউরে উঠলাম, কিন্তু পর মুহূর্ত্তে গিয়ে হাত চেপে ধরলাম। মনে হল বাবা পাঠিয়েছেন, অসীম শক্তি মনে এসে গেল। সেলাই করা হয়ে গেল এবং হাত সারতে দুদিন সময় লাগলো। পরদিন অরুণাকে নিয়ে আশ্রমে গেলাম। আমাদের দেখেই বাবা হাসতে হাসতে বল্লেন, "কাল যা ভয় হয়েছিল, এবার বুঝলে কেন তাড়াতাড়ি পাঠালাম ? বঁটী পড়ছে দেখেই তাড়াতাড়ি বঁটীটা ধরে ফেলেছিলাম, নইলে হাতটা দুখানা হয়ে যেত।" সকলের কাছে শুনলাম, আমরা যাবার পর বাবা দু ঘণ্টা ঘর থেকে বাহির হন নাই। কি তাঁর দয়া, কত বলবো !

বলে শেষ করা যায় না। আমরা তাঁর অধম সন্তান, কেউই তাঁর মূল্য দিলাম না। এখনও প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁর দয়ায় বেঁচে যাচ্ছি। তাঁকে শত শত কোটি প্রণাম।

"ন গুরোরধিকং তত্ত্বং ন গুরোরধিকং তপঃ"

শ্রীপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়, এম্-এ

শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতায় পার্থ-সারথি শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলেছেন, "ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হই।" ভারতীয় কৃষ্টিসম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করলে দেখা যায়—জগৎ যখন পাপ, তাপ, দুঃখ কষ্টে ভরে যায় তখনি এক মহাত্রাতার আবির্ভাব ঘটে মাটির এই পৃথিবীতে। এই মানুষরূপী দেবতাকেই আমরা বলে থাকি অবতার। ধর্ম্মের বিলুপ্ত প্রায় সংকীর্ণ ধারা আবার স্রোতস্বিনী হয়ে বয়ে চলে কয়েক যুগ ধরে। এই পৃথিবীতে অবতার জন্মগ্রহণ করেছেন দেশে দেশে—কালে কালে। প্রপীড়িত মানুষ আবার পায় আনন্দ, পায় শক্তি, পায় শান্তি। অবতার, মানুষের কাছে কোন কিছু প্রত্যাশা ক'রে এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন না। সংসারে পাপ এবং পাপী আছে জেনেই তাঁরা আসেন এই পৃথিবীতে, অমৃতের পুত্রদের অমৃত গরলে পরিণত হবার আগেই তাঁরা আসেন আনন্দ স্বরূপ অমৃতের পাত্র আবার ভরে দিতে। সৃষ্টির মধ্যেই স্রষ্টার আনন্দ, সৃষ্টির বিকৃতিতে স্রষ্টা দুঃখ পান। মানুষের ভগবান্ তাই মানুষকে ছেড়ে থাকতে পারেন না—মানুষের চলার পথের মধ্যেই তাঁর আনন্দ। তাই কবি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :—

"তোমার আনন্দ আমার পথ
তুমি তাই এসেছো নীচে,
আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর
তোমার প্রেম হতো যে মিছে।
আমায় নিয়ে মেলেছ এই মেলা,
আমার হিয়ায় চলছে রসের খেলা;
মূর্ত্তি তোমার যুগল সম্মিলনে
পূর্ণ প্রকাশিছে।"

মানুষের সঙ্গে ভগবানের যখন মিলন ঘটে, তখনই ভগবানের হয় পূর্ণ প্রকাশ। তাই আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বোধ হয়, ভগবানের immanental value ই যেন তাঁর পূর্ণরূপ, আর তাঁর transcendental value যেন তাঁর খণ্ডিত প্রকাশ। এই সম্বন্ধে একটি সুন্দর উপমা মনে পড়ে গেল। কথা প্রসঙ্গে একদিন আমি আমার দাদামশাই শ্রদ্ধেয় শ্রীক্ষেত্রগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে জিজ্ঞেস করি, "আচ্ছা দাদু, ভগবান্ যখন এক ও অদ্বিতীয় তখন তাঁর এই দুটো value কেন? উত্তরে দাদু বললেন, "দেখ্, রসগোল্লার রস যেমন রসগোল্লার ভিতরেও থাকে আবার বাইরেও থাকে, দর্শনের এই value concept দুইটি ঠিক সেই রকম।" সেইদিন থেকেই আমার ধারণা হয়েছিলো, এই পৃথিবীর প্রতি অণু-পরমাণুতেই ভগবান্ আছেন। বেদান্তের সেই অমৃতবাণী মনে পড়ে, 'সর্ব্বং খলু ইদম্ ব্রহ্ম"। এক অমোঘ এবং নির্দ্দিষ্ট নিয়মের বশবর্ত্তী হয়েই এই বিশ্ব প্রকৃতি চলেছে—এই নিয়ম কোনও আরোপিত রাষ্ট্র

নিয়ম নয়—অণু-পরমাণুর নর্ত্তনের মধ্যেই ইহা নিহিত। আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে যাবে, ভগবান্ এ নিয়ম কাউকে বলে দেন নি, আগুনের মধ্যস্থিত দাহিকা-শক্তিই হল তাঁর নিয়ম। অর্থাৎ প্রকৃতির প্রতি অণু-পরমাণুর মধ্যেই ঈশ্বর আছেন। সময় বিশেষে এই ব্যাপ্তশক্তিই কেন্দ্রীভূত হয়। তখন আমরা এই কেন্দ্রীভূত শক্তিকেই বলে থাকি অবতার। কার্য্যসমাপনান্তে এই কেন্দ্রীভূত শক্তিই আবার ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে—আমরা তখনই বলি অবতারের তিরোধান।

শ্রীশ্রীবাবা বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসের জীবন-কথা যতই আমি ভাবি আমার মনে হয় শ্রীশ্রীবাবাকে সদ্-গুরু বললে তাঁর সবটুকু বলা হয় না, তিনি অবতার। অবশ্য সদ্-গুরুই ভগবান্ এ কথা অনেকেই মানেন। সদ্-গুরু কে ? এই প্রসঙ্গে 'ওঁ শ্রীশ্রীজগদ্‌গুরু' পুস্তিকায় স্বামী বেদানন্দের লেখা থেকে একটু উদ্ধৃতি দিই,— "শ্রীভগবান্ স্বয়ং ভক্তের প্রতি, স্নেহ প্রেমের বশে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন—আমারই ত্রিগুণময়ী মায়ায় মোহিত হয়ে মানব সংসারে আবদ্ধ ; তাহার সাধ্য নাই যে এই মায়ার-চক্র হতে পরিত্রাণ লাভ করে ! তবে উপায় ? আমিই মানুষ রূপে অবতীর্ণ হয়ে জগতে এসে ভক্তের মায়ার বাঁধন কেটে দিয়ে তাকে উদ্ধার করি। আমার একান্ত শরণাগত ভক্তকুল যখন সংসার জ্বালায় দগ্ধ-বিদগ্ধ হয়ে আমাকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল ভাবে আর্ত্তনাদ করে, তখন আমি আর স্থির থাকতে পারি না। আমি মানুষ-বেশে সদ্-গুরুরূপে অবতীর্ণ হয়ে আমার ভক্তগণকে আমার স্নেহ প্রেমের বলে আমার পানে আকর্ষণ করে নিই।"

এই উদ্ধৃতি থেকে আমরা এই পাই যে মানুষ ব্যাকুল ভাবে ভগবান্‌কে পাবার জন্য আর্ত্তনাদ করলেই সদ্-গুরু আবির্ভূত হন এই পৃথিবীতে—আমার দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী শক্তির কেন্দ্রী-করণ হয়। যে ভক্ত বা ভক্তবৃন্দের ব্যাকুল বন্দনায় শ্রীশ্রীবাবা বিশুদ্ধানন্দের মতো গুরুর আবির্ভাব ঘটে এই পৃথিবীতে সেই সকল ভক্তবৃন্দের চরণে আমি আমার গভীর শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রণতি জানাই। ধন্য তাঁরা, ধন্য তাঁদের সাধনা, ধন্য তাঁদের ব্যাকুলতা।

শিশুকাল থেকেই গুরুদেব বলতে আমি বুঝতাম—শ্রীশ্রীবাবা বিশুদ্ধানন্দকেই। আমার বাবা, মা, ঠাকুর্দ্দা, ঠাকুমা, দাদামশাই, দিদিমা এবং দাদামশায়ের মা সকলেই তাঁর দীক্ষিত শিষ্য-শিষ্যা। আমার ঠাকুর্দ্দা স্বর্গীয় রায়সাহের ডাক্তার গগনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মুখে—গুরুদেবের ইউক্যালিপটাস্ তেল, স্ফটিক প্রভৃতি তৈয়ারীর কথা শুনেছিলাম। আমার মা প্রায়ই গুরুদেবের নানা লীলা-কথার বিষয় উল্লেখ করেন আমাদের সামনে, শ্রীশ্রীগুরুদেব তাঁদের কি রকম ছোট এলাচ, বড় এলাচ, ফুলের তোড়া থেকে কমলালেবু প্রভৃতি খাওয়াতেন। আমার দাদামশাইও নানা কথা শোনান গুরুদেবের বিভূতি সম্বন্ধে। ঠাকুর্দ্দাকে একদিন প্রশ্ন করেছিলুম, "আচ্ছা, গুরুদেব কি এসব যোগবলে তৈরী করতেন?" উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "না, প্রায় সবই তিনি বিজ্ঞানের বলে তৈরী করতেন।" বিজ্ঞান বলতে আমরা বুঝি বিশেষ জ্ঞান—যে বিশেষ জ্ঞানের ফলে এই অলৌকিক ক্রিয়া সম্ভবপর হতো, সে জ্ঞানের কথা আমি ধারণাই করতে পারি না। শ্রীশ্রীবাবা বিশুদ্ধানন্দের কাছে আমার দীক্ষা

গ্রহণ করা হয় নি, কারণ তাঁহার মহাপ্রয়াণের সময়ে আমার বয়স ছিল পাঁচ কিংবা ছয় বছর মাত্র। কয়েকবার মাত্র পুরীর আশ্রমে তাঁকে চাক্ষুষ দেখবার সুযোগ আমার হয়েছিল—তাতেই আমি নিজেকে ধন্য মনে করি।

বিশুদ্ধবাণীর প্রথম খণ্ডে শ্রদ্ধেয় শ্রীসুরেশচন্দ্র দেব মহাশয়ের "লৌকিক-অলৌকিক" বিষয়ক লেখ পাঠ ক'রে আমার মনে এই কথাটাই জেগেছে, যিনি জন্ম থেকেই অলৌকিক ক্ষমতা নিয়ে আসেন তাঁর পক্ষে অলৌকিক কার্য্যাবলীই স্বাভাবিক, অসাধারণত্বই তাঁর বৈশিষ্ট্য, সাধারণ হওয়াই তাঁর পক্ষে কঠিন। গুরুদেবের লৌকিক জীবন এবং অলৌকিক জীবনের মধ্যে কি কোনও দ্বৈতবোধ (dualism) ছিল ? ডাক্তার দেব লিখেছেন—"গুরুদেবের লৌকিক জীবনের অশুভ ঘটনাগুলি তাঁর অলৌকিক জীবনের শুভ ঘটনার সূত্রপাত।" এ থেকে কি আমরা ধারণা করে নিতে পারি না যে কোন মহাপুরুষের লৌকিক এবং অলৌকিক জীবন সম্পূর্ণ বিপরীতধর্ম্মী ?

পরম শ্রদ্ধেয়, পরম পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের লেখা থেকে আমার একটি জিনিষ উপলব্ধি হয়েছে। তিনি যে "dark night of the soul" এর কথা লিখেছেন তা থেকে আমার এই ধারণাই হয় যে, মানুষ যতই সত্যের পথে অগ্রসর হতে থাকে, অধ্যাত্ম জীবনটাই তাঁর কাছে সত্য হয়ে ওঠে এবং লৌকিক জীবন তার কাছে শুধু একটা আবরণ হয়ে দাঁড়ায়।

আমার এই ধারণা যদি ভ্রমাত্মক হয়, অর্থাৎ কোনও

সিদ্ধপুরুষের অলৌকিক জীবন এবং তাঁর লৌকিক জীবন বিপরীতধর্ম্মী না হয়ে যদি পরস্পরের পরিপূরক হয়, তা হলে কোনও অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন যোগীর লৌকিক জীবনের রূপ কিরূপ হবে ?

আমি আর একটি মাত্র প্রশ্ন ক'রে আমার এবারকার লেখা শেষ করব। আগেই বলেছি, মহাপুরুষ পৃথিবীতে আসেন দুঃস্থকে ত্রাণ করবার জন্য। বিবেকানন্দ তাঁর 'ভক্তিযোগ' পুস্তকে 'গুরুর প্রয়োজনীয়তা' প্রসঙ্গে বলেছেন, "ধর্ম্মের প্রকৃত বক্তাও আশ্চর্য্য, শ্রোতারও সুনিপুণ হওয়া আবশ্যক।" উদ্ধৃতি স্বরূপ তিনি লিখেছেন, "আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা" ইত্যাদি। যখন গ্রহীতার আত্মার ধর্ম্মালোককর্ষিণী শক্তি পূর্ণা প্রবলা হয় তখনই সেই আকর্ষণে আকৃষ্টা আলোকদায়িনী শক্তি অবশ্য আসিয়া থাকে।" "যখন গুরু এবং শিষ্য উভয়েই আশ্চর্য্য ও অসাধারণ হয়, তখনই আশ্চর্য্য আধ্যাত্মিক উন্নতি ঘটে, অন্য স্থলে নহে।" সাধারণ মানুষের মাঝে যখন সদ্‌-গুরু আবির্ভূত হন এবং সাধারণ মানুষকে যখন তিনি দীক্ষিত করেন, তখন সাধারণ শিষ্যের মাঝে এই আধ্যাত্মিক উন্নতি কিরূপে সম্ভবপর ? পরম কারুণিক যীশুখৃষ্ট বলেছেন, "পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে কখনও ঘৃণা করিও না।" পৃথিবীর পাপীদের কিরূপে সদ্‌-গুরু দ্বারা মুক্তিলাভ সম্ভব, যখন তাদের জ্ঞান ও ভক্তি দুইয়েরই অভাব লক্ষিত হয় ?

শ্রীশ্রীবাবা বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস পরম কারুণিক। কোনও শিষ্য শিষ্যারই জ্ঞান বা সত্যভক্তির অপেক্ষা না রেখেই তিনি

তাঁর অমৃত মন্ত্রে সকলকে দীক্ষিত করেছেন। শুনেছি, তাঁর বহু শিষ্যকেই তিনি বিভিন্ন সঙ্কট থেকে উদ্ধার করেছেন। তাঁর উদ্দেশ্যে আমি প্রণাম করি। বন্দনা করি তাঁর এই সার্ব্বজনীন মমত্ববোধকে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তাঁর শ্রীচরণে আমার প্রণতি জানিয়ে বলি—

"বাঁধন ছেঁড়ার সাধন তাহার, সৃষ্টি তাহার খেলা,
দস্যুর মতো ভেঙ্গে চুরে দেয় চিরাভ্যাসের মেলা।
মূল্যহীনেরে সোনা করিবার
পরশ পাথর হাতে আছে তার
তাইতো প্রাচীন সঞ্চিত ধনে উদ্ধত অবহেলা।"

"জয় গুরু"

শততম জন্মদিনোৎসব

রায় সাহেব শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত, কবিরত্ন, এম-এ

পরম পুণ্যশ্লোক শ্রীশ্রীগুরুদেবের মুখেই শুনিয়াছি ধরাতলে তাঁহার মঙ্গলময় আবির্ভাব হয় বাঙ্গালা ১২৬২ সালের ২৯শে ফাল্গুন তারিখে। তদনুসারে গত ১৩৬২ সালের ২৯শে ফাল্গুন গিয়াছে তাঁহার শততম জন্মদিন। অর্থাৎ তিনি দেহে থাকিলে ঐ দিনে তাঁহার বয়স একশত বৎসর পূর্ণ হইত।

ইদানীং আমাদের দেশে ক্ষুদ্র-বৃহৎ অনেক ঘটনারই শত-বার্ষিক স্মরণ দলবদ্ধ ভাবে হইতেছে এবং ঘটনার গুরুত্ব, গুণগ্রাহিগণের বহুত্ব এবং তৎসঙ্গে অর্থের ও উৎসাহের প্রাচুর্য্য থাকিলে আড়ম্বর স্থানে ও কালে ব্যাপক ভাবেই হইতেছে। এই সকল "শত-বার্ষিকী" অবশ্য আমাদের এককালীন প্রভু ও বর্ত্তমানেও আদর্শ স্থানীয় ইংরাজী প্রথার অনুকরণেই হইতেছে। বিলাতী গন্ধ না থাকিলে ইহা এত জনপ্রিয় হইত না। বিলাতী অনুকরণে কেবল শত-বার্ষিকী নয়, জুবিলি, স্বর্ণ-জুবিলি, হীরক-জুবিলি পর্ব্বও হইতেছে।

সে যাহা হউক, শতসংখ্যাটির কিছু মাহাত্ম্য প্রাচীন হিন্দু মতেও স্বীকার্য্য বলিয়া মনে হয়। ধনী গৃহে, সাধুসন্তগণের আশ্রমে শতচণ্ডীপাঠ ও হোম, শতরুদ্রীয় হোমাদি হয়। সাধারণ গৃহস্থ গৃহেও নারায়ণকে শততুলসীপত্র দান, অখণ্ড শতবিল্বপত্র দ্বারা হোম ইত্যাদিও হয়। বিশেষ বিশেষ দেবতার

শতনাম পাঠ বা স্মরণও অনেকে প্রায় প্রত্যহ করেন। গায়ত্রী জপ দশবার করিলেও চলে, শত সংখ্যায় জপই প্রশস্ত ;—'শতং জপ্তা তু সা দেবী পাপোপশমনী স্মৃতা'; শতবার জপ করিলে দেবী গায়ত্রী পাপের উপশম করেন। তান্ত্রিক ইষ্টমন্ত্র জপের নিম্নতম নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা একশত, অবশ্য যত সংখ্যাই জপ করা হউক উপসংহাররূপে অতিরিক্ত আটবার জপের একটা নিয়ম আছে। শত সংখ্যাটি একটু মোটা (ইংরাজীতে যাহাকে বলে sizable) বলিয়াই যে এই সকল নিয়ম তাহা অন্ততঃ সর্ব্বক্ষেত্রে নাও হইতে পারে। তদতিরিক্ত হেতু থাকাও সম্ভব। শ্রীশ্রীবাবার মুখে শুনিয়াছি, তিনি যখন জ্ঞানগঞ্জে ছিলেন ঐ সময় মধ্যে তাঁহার পূজনীয় গুরুদেব মহর্ষি মহাতপার তেরশততম জন্মোৎসব হয় এবং তাহা (দেশ কাল পাত্রোচিত) যথেষ্ট ঘটা সহকারেই করা হইয়াছিল। তদুপলক্ষ্যে অসংখ্য কুমারীকে কৌষেয় বস্ত্র ত দেওয়া হইয়াছিলই, পরন্তু পরমহংসগণ এবং ভৈরবী মাতারাও বস্ত্র পাইয়াছিলেন। তেরশত শতেরই পূরণ। শতসংখ্যার একটা গূঢ় (esoteric-আধ্যাত্মিক) মর্য্যাদা না থাকিলে জ্ঞানগঞ্জের মত সিদ্ধক্ষেত্রে শতবার্ষিকীর আয়োজন হইত না এবং সর্ব্বোপাধিবিনির্মুক্ত শত শত বর্ষ-বয়স্ক পরমহংসগণ ও ভৈরবী মাতারা তাহাতে সোৎসাহে প্রবৃত্ত হইতেন না।

এই সব ভাবিয়া চিন্তিয়া গত বৎসরের শেষভাগে আমাদের মধ্যে কাহারও কাহারও মনে হইয়াছিল শ্রীশ্রীবাবার শততম জন্মদিনে কর্ত্তব্য উৎসব সম্বন্ধে কিছু বিশেষ রকমের ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। শ্রীশ্রীবাবা তাঁহার নিজ বা আশ্রম সংক্রান্ত

কোনও ব্যাপারেই অতিরিক্ত আড়ম্বর অনুমোদন করিতেন না। তিনি হৈ-চৈ এর এবং যে কোন বিষয়ে (এমন কি কীর্ত্তনে পর্য্যন্ত) মাতামাতির বিরোধী ছিলেন। কিন্তু যথেষ্ট সাত্ত্বিক ভাবে এবং তাঁহারই অনুমোদিত পন্থায় একটু ঘটা করিয়া আনন্দের ব্যবস্থা করিলে কোনও দোষ হইতে পারে না। এই উপলক্ষ্যে একটু বেশী সংখ্যায় গুরুভ্রাতা, ভগিনী এবং শ্রীশ্রীবাবার ভক্তগণের সম্মেলন হইলেও তাহাতে বিশুদ্ধ আনন্দ পাওয়া যায়, নানা বিষয়ক আলোচনাদি দ্বারা উপকৃতও হওয়া যায়।

শ্রীশ্রীবাবা যতদিন দেহে ছিলেন ততদিন তাঁহার জন্মোৎসব সাধারণতঃ কলিকাতায় বা কাশীতে হইয়াছে। তাঁহার দেহরক্ষার পর পূজনীয় গুরুপুত্র দুর্গাদাদা ঐ উৎসবের ব্যবস্থা বণ্ডুলেই করিতেন। এখনও সেই নিয়মই বলবৎ রহিয়াছে। আমাদের এবার মনে হইয়াছিল, আমাদের কল্পনানুরূপ বিশেষ ব্যবস্থা বণ্ডুলে সম্ভব হইবে না। তথায় যাতায়াতের অসুবিধা বহুজনের পক্ষে কষ্টকর। কুমারীও অধিক সংখ্যায় পাওয়া যায় না। বেদপাঠাদি বা বিশেষ প্রকারের হোমাদির ব্যবস্থাও দুঃসাধ্য। স্থানেরও সঙ্কীর্ণতা আছে। এই সকল বিষয়ে কাশীর বিশুদ্ধানন্দ কানন আশ্রমের তুলনা নাই। নবমুণ্ডী আসনের মাহাত্ম্য ক্রমশঃ স্ফুটতর হইতেছে। এবার বাবার জন্মদিনের মাত্র তিনদিন পূর্ব্বে ৺শিবরাত্রি উৎসবও ছিল। সে উৎসব বরাবর কাশীর উক্ত আশ্রমেই হইয়া আসিতেছে। কাশীতে ৺শিবরাত্রি যাপনও অনেকেরই কাম্য। সেইজন্য মনে হইয়াছিল বাবার

শততম জন্মোৎসবটিও কাশীতে হইলে হয়ত বহু শিষ্যশিষ্যা তথায় সমবেত হইতে উৎসাহ বোধ করিবেন।

কিন্তু আমাদের প্রস্তাব গুরুপরিবারের মনঃপূত হইল না। তাঁহারা বলিলেন, জন্মোৎসব জন্মস্থানে হওয়াই সঙ্গত। ইহার উপরে আর কথা নাই। ভাবিলাম বাবার যেমন ইচ্ছা তেমনই ত হইবে। বণ্ডুলের মাহাত্ম্যও অস্বীকার্য্য নয়। তত্রত্য হর-হরি-লিঙ্গের মহিমাও অপূর্ব্ব। গুরুপৌত্র শ্রীযুক্ত সরোজমোহন বাবাজী শ্রীশ্রীগুরুদেবের শততম জন্মোৎসব বণ্ডুলে হইবে ইহা জ্ঞাপন করিয়া আমন্ত্রণ পত্র বাহির করিলেন। কাশী আশ্রম হইতে কেবল ৺শিবরাত্রি উৎসবের আমন্ত্রণই যথারীতি বাহির হইল।

শ্রীশ্রীবাবার ইচ্ছায় বণ্ডুলের উৎসব সুচারুই হইয়াছিল। বাহির হইতে শিষ্যশিষ্যা এবং তাঁহাদের পুত্রকন্যাদি যাঁহারা গিয়াছিলেন তাঁহাদের সংখ্যা প্রায় একশত হইবে। গ্রামে যতটি কুমারী পাওয়া গিয়াছিল তাঁহাদের সেবার আয়োজনও খুব ভালই হইয়াছিল। উৎসাহী ব্যক্তিগণ একটু নগর-কীর্ত্তনের ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন। সঙ্গীতও কিছু হইয়াছিল, এক শিষ্যের একটি নয় দশ বৎসর-বয়স্কা কন্যা তাঁহার স্কুলে শেখা নৃত্য দেখাইয়া সকলকে আনন্দও দিয়াছিলেন। মোটের উপর, বণ্ডুলের উৎসব সাফল্যমণ্ডিতই হইয়াছিল। ইহার জন্য অন্য কাহারও কাহারও সঙ্গে কনিষ্ঠ গুরুপৌত্র শ্রীযুক্ত ষোড়শীমোহন বাবাজীর কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য।

কাশীতে ৺শিবরাত্রি উৎসবও শ্রীযুক্ত গোপীনাথ (কবিরাজ),

শ্রীযুক্ত গৌরীচরণ (রায়), শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ম্ময় (গাঙ্গুলী) দাদাদের সমুচিত উৎসাহে ও উদ্যমে সুসম্পন্ন হইল। কুমারী মাতারা নব্বইটি সেবা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তদুপরি আগন্তুকও বহুতর সংখ্যায় ছিল।

কিন্তু লীলাময়ের লীলা ঐখানে শেষ হয় নাই। তাঁহার দেহরক্ষার পরে কাশীর আশ্রমে স্থানীয় গুরুভ্রাতৃগণ নিজেদের দায়িত্ব ও ব্যয়ে যে ভাবে তাঁহার জন্মদিনের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন, শততম জন্মদিনেও সেইরূপ করা ছাড়া অন্য গতি ছিল না। এই দিনটির যে একটি বিশেষ মাহাত্ম্য আছে, যে বিষয়ে আমরা সম্যক্‌রূপে সজাগ ছিলাম না, তাহা তিনি বুঝাইয়া দিবার ব্যবস্থা নিজেই করিলেন। নিশ্চয় ইহার গভীরতর সার্থকতাও আছে। তাঁহার দেহে থাকা কালে তাঁহার মাহাত্ম্য এবং আমাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমরা যতটা সচেতন ছিলাম এখন ততটা (অন্ততঃ সকলে) নই, ইহা অস্বীকার করা যায় না। আমাদের সুপ্তপ্রায় চেতনাকে উদ্রিক্ত করার প্রয়োজন আছে। বাবা আছেন এবং আমাদের সকল ক্রিয়া কলাপ লক্ষ্য করিতেছেন, বিশেষ বিশেষ স্থলে তাঁহার পরমাণু এখনও শুধু বর্ত্তমান নয়, কিন্তু সক্রিয়, ইহাও আমাদের মনে রাখা আবশ্যক। বাবা হয়ত এই প্রকারে তাহা বুঝাইয়া দিলেন।

জন্মোৎসবের কয়েকটি দিন মাত্র পূর্ব্বে অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে একটি গুরুভ্রাতা (যিনি স্বনাম প্রকাশে অত্যন্ত অনিচ্ছুক এবং যিনি জানিতেন না যে শততম জন্মোৎসবটি কাশীতে করিবার জন্য ইচ্ছা করিয়া আমরা সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছি)

অতি সঙ্গোপনে শ্রীযুক্ত গোপীনাথের হস্তে ছয়শত টাকা দিয়া একশত আটটি (পাঠক সংখ্যাটি লক্ষ্য করিবেন) কুমারীকে সবস্ত্র সেবা করাইবার অনুরোধ করেন। আরও একটি গুরুভ্রাতা (যিনি অবশ্যই বণ্ডুলেও উৎসব জন্য যথেষ্ট টাকা দিয়াছিলেন) কাশীতে শিবরাত্রি জন্য একশত টাকার সঙ্গে জন্মদিনের জন্যও একশত টাকা পাঠাইলেন। এই সংবাদ পাইয়া বাহির হইতেও কেহ কেহ (যাঁহারা বণ্ডুলে উৎসব জন্য কিছু কিছু দিয়াছিলেন) সাধ্যানুসারে কিছু কিছু টাকা পাঠাইলেন। কাশীস্থ গুরুভ্রাতারাও অবশ্য সাধ্যানুরূপ দিলেন। এইরূপে বাবার খেলা আরম্ভ হইল।

ইহার মাসেক পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত গোপীনাথ প্রভৃতির ইচ্ছা হইয়াছিল বিজ্ঞান-মন্দিরে একতলার যে প্রকোষ্ঠটিতে বসিয়া শ্রীশ্রীবাবা দর্শনার্থীদিগের সহিত আলাপ করিতেন, তথায় তাঁহার খাট ও শয্যার উপরে তাঁহার একখানি তৈলচিত্র স্থাপন করেন। (সেখানে কয়েক বৎসর যাবৎ একখানি কিঞ্চিৎ enlarged ফটো ছিল।) তজ্জন্য একটি শিল্পীকে আড়াই শত টাকা অঙ্গীকার করিয়া একখানি তৈলচিত্র অঙ্কিত করাইবার ব্যবস্থাও হইয়াছিল। শ্রীশ্রীবাবার শততম জন্মদিনের মাত্র দশ দিন পূর্ব্বে ঐ চিত্রটি প্রায় সম্পূর্ণ হওয়ায় স্থির হয় জন্মদিনেই উহা যথাস্থানে কিঞ্চিৎ অনুষ্ঠান সহকারে রক্ষিত হইবে।

চিত্রটি যেদিন শ্রীযুক্ত গোপীনাথ প্রভৃতির পরিদর্শন জন্য আশ্রমে আসিল, সেদিন কোনও একটা অসাধারণ যোগাযোগে শ্রীমা আনন্দময়ী তথায় উপস্থিত। চিত্রখানি হলঘরের দক্ষিণ দেয়ালে টাঙ্গান হইলে তাহা দেখিয়া শ্রীমা অত্যন্ত উল্লাস প্রকাশ

করিলেন। তিনি বাবাকে (দেহে থাকা কালে) আরাম কেদারায় উপবিষ্ট দেখিয়াছিলেন। চিত্রটিতে অঙ্কিত মূর্ত্তিও আরাম কেদারায় উপবিষ্ট। মা বলিলেন, "বাবাকে আমি যে মূর্ত্তিতে দেখিয়াছিলাম, বাবা ঠিক সেই মূর্ত্তিতেই আসিয়া আমাকে দেখা দিলেন। ঐ দেখ, বাবার দাঁড়ি নড়িতেছে, বাবা আমার দিকেই চাহিয়া আছেন, তাঁহার দেহের এখানে এখানে স্পন্দনও দেখা যাইতেছে।" বুঝা গেল মায়ের কাছে চিত্রগত বাবা প্রাণবান্ হইয়াই আসিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া চিত্রটি যে পরবর্ত্তী মাহাত্ম্যপূর্ণ দিনের মাহাত্ম্য-বৈভবযুক্ত হইয়া আসিয়াছিল তাহাও বুঝা যাইবে।

এখন সেইদিনের কথাই বলি। ২৯শে ফাল্গুন, ১৩৬২ সাল, মঙ্গলবার সকাল সাড়ে আটটায় শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রগোপাল (বন্দ্যো) দাদা চিত্রের আবরণ উন্মোচন জন্য প্রস্তুত হইলেন। গুরু-ভ্রাতাদিগের মধ্যে বর্ত্তমানে তিনিই বোধ করি প্রাচীনতম। মূর্ত্তির দুই পার্শ্বে মেজেতে বসিয়া দুইজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বেদপাঠ করিতেছেন। সমবেত সকল লোক মূর্ত্তি দর্শন জন্য কেহ কেহ প্রকোষ্ঠ মধ্যে ও অনেকে দুই দিকের বারান্দায় দাঁড়াইয়াছেন। আটটা চল্লিশ মিনিটে আবরণ উন্মোচিত হইল। সকলে প্রণাম করিয়া বেদপাঠ সম্পূর্ণ হওয়া পর্য্যন্ত যুক্তকরে দাঁড়াইয়া আছেন। এই অতি সাত্ত্বিক পরিবেশের মধ্যে প্রকোষ্ঠ মধ্যে দণ্ডায়মান একটি স্বভাবতঃ ধীর-প্রকৃতি ও সম্পূর্ণ সুস্থ-মস্তিষ্ক গুরুভ্রাতা দেখিলেন তৈলচিত্র যেন সহসা সজীব হইয়া উঠিল। বাবার চক্ষে পলক পড়িতে লাগিল; পরে (তিনি দেখিলেন))

বাবার চক্ষু হইতে একটা তীব্র রশ্মি বাহির হইয়া সব যেন পীত আলোকে ঢাকিয়া ফেলিল। ক্রমে ঐ জ্যোতি রক্তবর্ণ হইয়া শুভ্রবর্ণ ধারণ করিল। ঐ জ্যোতি যে কত উজ্জ্বল ও মনোরম তাহা না কি বর্ণনা করিয়া বুঝান অসম্ভব। এই সময়ে (ভক্ত গুরুভ্রাতাটির দৃষ্টিতে) তৈলচিত্র অন্তর্হিত হইয়া গেল এবং তৎস্থলে শ্রীগুরুদেবের জীবন-সংক্রান্ত নানা দৃশ্য পর পর প্রকট হইতে লাগিল। ইহার পরে গুরুভ্রাতাটি প্রকোষ্ঠ মধ্যেই বাবার নানা বয়সের মূর্ত্তিসকল দেখিতে লাগিলেন। একটির পর একটি করিয়া কত মূর্ত্তিই যে প্রকাশ পাইল তাহা না কি বলিয়া শেষ করা যায় না।* অবশেষে হঠাৎ এই অলৌকিক দর্শন সমাপ্ত হইল, তৈলচিত্র পুনরায় দৃষ্টিপথে যথাস্থলে প্রকটিত হইল। বেদপাঠও সম্পূর্ণ হইল, সকলে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন।

ইহার পরে সকলে শ্রীশ্রীবাবার মর্ম্মরমূর্ত্তির নিকট গেলেন, তথায় ও মন্দিরের বারান্দায় মূর্ত্তির দুই দিকে বসিয়া বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদ্বয় বেদপাঠ করিতে লাগিলেন এবং গুরুভ্রাতাভগিনীগণ এবং অন্যান্য অনেকে শ্রীশ্রীবাবার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন। এখানেও পরিবেশটি খুব সাত্ত্বিকই হইয়াছিল।

বেলা দশটায় কুমারী ভোজন হয়। একশত বারটি কুমারী মাতা সবস্ত্র সেবা গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেবার আয়োজনও খুবই ভাল অর্থাৎ যেমন বিবিধ, তেমনই রুচিকর ও প্রচুর হইয়াছিল। শ্রীশ্রীবাবা দেহে থাকাকালে কাশী আশ্রমে যে কোনও বৃহৎ

---

* এই দর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দ্রষ্টার স্বীয় লেখনী হইতেই প্রকাশিত হইয়াছে (দ্রষ্টব্য—বিশুদ্ধবাণী, পঞ্চম ভাগ, পৃঃ ৯০—৯২)। —সম্পাদক।

ব্যাপারে কুমারীদিগের জন্য ভোগ রন্ধনকালে ক্ষেত্রদাদাই পরিদর্শন করিতেন। এবারেও তিনিই তাহা করেন, অধিকন্তু ঘৃতান্ন স্বহস্তে রন্ধন করেন। বৃদ্ধ বয়সে দিন-মাহাত্ম্যে দাদার শরীরে নব বল ও উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছিল।

কুমারীমাতারা ছাড়া আহূত ও রবাহূত অতিথিও বহু ছিলেন। ইহাদের মধ্যে বিশিষ্ট লোকও অনেক ছিলেন। হাজার হাজার শিষ্যের গুরু একজন সাধু ব্যক্তিও ছিলেন। তা ছাড়া সধবা, বিধবা, কুমার, ব্রাহ্মণ, সাধু ও দরিদ্রের সংখ্যাও কম হয় নাই। মোটের উপর ন্যূনাধিক চারি শত লোক ভোজন করেন। কোনও জিনিষের অকুলন হয় নাই।

বিকালে গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত সুবোধ রক্ষিতের কন্যা বিজ্ঞান মন্দিরে তৈলচিত্রের সম্মুখে বসিয়া বাবাকে কয়েকটি সঙ্গীত শুনাইয়া সকলকে আনন্দ দান করে।

এইভাবে বলিতে গেলে আগাগোড়া সম্পূর্ণ বাবারই ইচ্ছায় সুচারুভাবে কাশীর আশ্রমেও শততম জন্মদিনোৎসব নিষ্পন্ন হইয়াছিল। এই উপলক্ষ্যে যাঁহারা কর্ম্ম করিবার অধিকার পাইয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই ধন্য হইয়াছেন। কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম; তাহাতে অংশ গ্রহণের অধিকার পাওয়া সৌভাগ্যের ফল।

ক্রিয়াকালে আসনে বসিয়া যে সকল দর্শনাদি হয় তাহা প্রকাশ করা নিষিদ্ধ। কিন্তু এই বিশেষ ব্যাপারে উপরে যে অলৌকিক দর্শনের বিষয় বিবৃত হইল, তাহা সে শ্রেণীর গোপনীয় দর্শন নয়। ইহার উদ্দেশ্য উৎসব উপলক্ষ্যে যাঁহারা অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন তাঁহাদের একজনকে দর্শন দ্বারা

বুঝাইয়া দেওয়া তিনি তাঁহাদের সকলের সেবাই সানন্দে গ্রহণ করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন ইহার আরও একটা বিশেষ সার্থকতাও নিশ্চয়ই আছে। তদ্বিষয়ে আমার অনুমান পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। শ্রীশ্রীবাবার অপার অগাধ করুণা, তাঁহার অপ্রমেয় মাহাত্ম্য, তাঁহার পরমাণুপূত আশ্রমসমূহের মাহাত্ম্য এবং সর্ব্বোপরি দুইবেলাই বিশেষভাবে তাঁহার সন্নিধিকারক কর্ম্ম—এই সকল বিষয়ে আমরা যেন সর্ব্বদা সজাগ থাকি ইহাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

শ্রীশ্রীগুরু-স্মৃতি-প্রসঙ্গ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীবীণাপাণি দেবী

বাবার অপার করুণা

আমার দীক্ষার পর কয়েকবার বাবার যে প্রত্যক্ষ অনুভূতি পাইয়াছি তাহা অতি অপূর্ব্ব। স্মরণীয় দিনগুলি আজও আমার সামনে ভাসিতেছে। তাঁহার দয়া অঝর ঝরে ঝরিতেছে, তবু অন্ধ জীব আমি একটু দুঃখ বোধ করিলেই বলি, 'বাবা দয়া কর।' বস্তুতঃ তাঁহার কৃপা অবিরত জলের ধারার ন্যায় ঝরিতেছে। যখনি ফিরে চাই দেখতে পাই আর বলে উঠি, 'বাবা, তুমি কত করুণাময়।'

প্রথম অনুভূতি হয় দীক্ষার তিন চার মাস পরেই। আমার অসুখ সামান্য জ্বর, কিন্তু কিছুতেই কমে না। এক মাস পরে দাদু বড় চিন্তিত হইলেন এবং কবিরাজী চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। কিন্তু রোগ না কমিয়া নানা উপসর্গ আসিতে লাগিল। ক্রমশঃ শয্যাশায়ী অবস্থা এবং ফুসফুস-রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ি। দুই মাস পরে কঙ্কালসার অবস্থা। দাদুর জানিত রিটায়ার্ড একজন সিভিল সার্জ্জন এবং ডাঃ প্রবোধ ব্যানার্জ্জী চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। ভয়ানক কাসি, কাসিতে কাসিতে যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া দাদুকে বলিতাম, 'দাও, দাদু, ভাল করে দাও।' তিনি চোখের সামনে গুরুদেবের ফটোটি

টাঙ্গিয়ে রেখেছিলেন। বলিতেন, "দাদু তো ভাই কিছু করিতে পারিবেন না। তোমার সামনে তোমার ঠাকুর রয়েছেন, তিনি তোমার ভার মঙ্গল হাতে তুলে নিয়েছেন। কষ্ট হলে তাঁকেই বল যে তিনি যেন তোমায় কষ্ট সহ্য করার শক্তি দেন।" তাঁর কথা মত যখনই অসহ্য যন্ত্রণা হইত তাঁর দিকে চেয়ে প্রার্থনা করিলেই আশ্চর্য্য ভাবে যন্ত্রণা কমিয়া যাইত। এইভাবে ছয় মাস কাটে। সকলের ধারণা আমি বাঁচিব না, ডাক্তাররাও আশঙ্কা করিতেন যে বোধ হয় বাঁচিব না।—এর পর দাদুর কাছে যাহা বহুবার শুনিয়াছি তাহাই লিখিতেছি।

ডাক্তার জবাব দিয়াছে। বলিয়া গেল, "এই ঔষধ দিয়া যাইতেছি, জ্বর কমবার মুখে দিবেন।" দাদু বলিতেন, সে একটি দিন,—একমাত্র নাতনী, সবই গুরুর ইচ্ছা। বাড়ীতে সকলেই বিমর্ষ। বারটা রাত্রি। দাদু নাড়ী ধরিয়া বসিয়া, আমি হঠাৎ বলিয়া উঠিলাম, "দাদু, আমি তোমার কোলে শোব।" দাদু মাথা তুলিয়া কোলে রাখিলেন। বলিলাম, "গীতা পড়।" "কোথায় পড়িব ?" "বিশ্বরূপ দর্শন।" তিনি তাহাই করিতে লাগিলেন। "আচ্ছা, তুমি কি আমার শ্রীগুরুদেব ?" 'বাবা' 'বাবা' করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলাম। তাহার পর জীবনীশক্তি তিন চার ঘণ্টা বাদে স্বাভাবিক হয়। ইহার কিছুদিন পরে যখন গুরুদেবের কাছে যাই বাবা আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "কিগো, তোমার দাদু বাবা হয়ে গিয়েছিল ? যাই হোক, তুমি তো ভাল হয়ে গিয়েছ। একটি কথা। গীতা সর্ব্বশাস্ত্রের সার—'গীতা' এই কথাটি বুঝিতে পারিলেই সব বোঝা যায়। 'বোধস্বরূপং

নিজবোধরূপম্।' ভাল ক'রে ক্রিয়া করবে বাপু। খালি বাবাকে ডেকে 'আমায় ভাল করে দাও' বললে চলবে না। বাবা যা বলে তা করার চেষ্টা করবে।"

ইহার কিছুদিন বাদে অর্থাৎ পাঁচ ছয় বৎসর পরে. আমার পিতা ভাগলপুরের বাড়ীর অংশ বালবিধবা বলিয়া আমায় দানপত্র করিয়া দেন। বাড়ীটির যে অংশ আমি পাইয়াছিলাম তাহাতে অল্প জমী ও খোলার ঘর ছিল। দাতুর কথা মত আমি সেখানে বাড়ী করিতে যাই, যাহাতে ভাড়া চলে। কিন্তু সেখানে আমার কেহই সহায় ছিল না, সম্পূর্ণ বিদেশ। যাই হোক, সেখানে কাকার কাছে যাই, এবং আপন অভিপ্রায় জানাইয়া কার্য্য সুরু করি। আমার সঙ্গে বাবার ফটো ছিল, সেইটি সর্ব্বদা আমার কাছে থাকিত। কিন্তু বাড়ী করিতে গিয়া বড় ঝঞ্ঝাটে পড়ি। কাকীমা বলিলেন, "তোমার গুরুর সামনে একটি পূর্ণ ঘট স্থাপনা কর এবং প্রত্যহ তাঁহাকেই আপন অভিপ্রায় জানাও।" আমার জমীর পাশে একটি খারাপ স্ত্রীলোক বাস করিত। তার দাবী—আমরা তার জমী দখল করিয়াছি। সে গোলমাল করিয়া ফৌজদারী বাধায় এবং আমাকে তিন চারজনের সঙ্গে আসামী করে। আমার উকিল বলিলেন, "তোমার নিজের সীমানায় প্রাচীর দিয়ে নাও। ঘর ভেঙ্গ না। কোর্ট থেকে মাপ হইবার পর ঘর ভাঙ্গিও।" তাঁহার কথা মত আমার জ্যেঠাত ভাই কার্য্য আরম্ভ করিল। পঞ্চাশ ফুট পাঁচিল দিতে হবে, অনেক লোক লাগান হইয়াছে। দুপুর বেলা, আমরা ঘরে বসিয়া গোলমাল করিতেছি। হঠাৎ খুব জোরে দালান ঘর কাঁপিয়া উঠে এবং

চীৎকারসহ 'হায় হায়' শব্দ। আমরা বাহির হইয়া দেখি, আমার অংশের খোলার ঘরগুলি দেয়াল শুদ্ধ যেদিকে বনেদ কাটা হইতেছিল হেলিয়া পড়িয়াছে। আমার ভাসুর সেইখানেই কাজ করাইতেছিলেন, তাঁহাকে এবং তিনটি মজুরকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। আমার তখনকার মনের অবস্থা বাবাই জানেন। চীৎকার করিয়া উঠিলাম, "বাবা, তুমি এস, বাঁচাও।" এমন একটি স্থানে দাঁড়াইয়াছিলাম যে মাটি নড়িতেছে, আর একটু নড়িলেই আমি তাহার নীচে পড়ি। জানি না—বিপদে কোন জ্ঞান নাই। হঠাৎ কে যেন আমাকে পিছন দিকে সবলে টানিয়া লয় ও বলে, "কি বেকুফ মেয়ে।" বুঝিলাম এ যে আমার দয়াল গো! পাই স্পর্শ, পাই গন্ধ, ফিরে দেখি কেহ নাই। খোঁজ খোঁজ চীৎকার। বনেদ দুই মানুষ ভোর খুঁড়িয়াছিল, তাহার মাটি উঠান হইতে লাগিল, দেখা গেল, গলা অবধি পোতা তিনটি মজুর অজ্ঞান অবস্থায় এবং আমার ভাসুর কড়িকাঠ এবং মাটির খোলার ভিতর চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। আশ্চর্য্য, কেহই তেমন আঘাত প্রাপ্ত হয় নাই এবং গুরু-কৃপায় সব বিপদ হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হই। আট মাস ভাগলপুর থাকিয়া কাশীতে ফিরিয়া শুনিলাম গুরুদেব আশ্রমে আছেন। তৎক্ষণাৎ বাবার শ্রীপাদপদ্মে উপস্থিত হইয়া বাবার নিকট সব ঘটনা জানাইলে বাবা বলিলেন, "সবই জানি বাপু। এত কষ্ট ভোগ হোল। ঐ জমীটা অভিশপ্ত, উহার নীচে মুসলমানের কবর আছে পিছন দিকে। ঐ বাড়ী তুমি রাখতে পারবে না এবং অনেক ঝঞ্ঝাট পোহাতে হবে। যাই হোক, একটা ব্যবস্থা হয়েই যাবে।" বাবার শ্রীমুখ হইতে এই কথা শুনিয়া

বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়ি। বলিলাম, "যা আপনি করিবেন বাবা, তাই হবে। "আমি আর কি করিব বলুন।" বাবা বলিলেন, "বিশ্বাস ক'রে ধরে থাকলে অনেক কিছু দেখতে পাবে। তবে মুখে বাবা বল্লে কিছুই হয় না। অনেক ছেলেমেয়ে, সকলের জন্যই ব্যস্ত থাকতে হয়। গুরু হওয়া কি সহজ ?"

ইহার দিন কয়েক পরের ঘটনা। বাড়ীতে কি কর্ম্ম উপলক্ষে লোকজন আসিয়াছে। শুভকর্ম্ম, আমি বিধবা বলিয়া কোন মাঙ্গলিক দ্রব্য ছুঁইবার অধিকার নাই। সকলেই মুখে আহা, উহু করিতেছে। বলিতেছে, 'এই ছেলেমানুষ, এমন ভাগ্য, কি ক'রে জীবন কাটাবে, কে চির-জীবন দেখবে, ভাত কাপড় কে যোগাবে, ভাগ্যে কত দুঃখ আছে,' ইত্যাদি ইত্যাদি। মনে বড় আঘাত লাগিল। তবে যে দাদু বলেন, 'তোমার সকল ভার গুরু নিয়েছেন'। তিনিই ত আমায় দেখবেন, তবে এরা এত কথা কেন বলিতেছে ? রাত্রে ঘুমাইতে পারি না, কেবল প্রশ্ন উঠে, 'আমায় বিধবা কে সাজালে, কার এ খেলা, ভাগ্য কাকে বলে, এই বিড়ম্বিত ভাগ্য কি করিলে উল্টাইবে এবং কি করিলে শান্তি পাইব ?' পরদিন আবার বাবার কাছে যাই। আমায় দেখেই বাবা বলিলেন, "টিয়া রাম নাম ভুলে আবার নিজের ট্যাঁ ট্যাঁ বুলি ধরেছে, বাপু।" কিন্তু বাবার এইকথা কিছুই বুঝিলাম না। মনে তীব্র অভিমান ও দুঃখ। প্রণাম করিয়া উঠিয়াই বলিয়া উঠিলাম, "বাবা গো, আমি বড় দুঃখী বিধবা, আমার পেটে ভাত নাই, মনে শান্তি নাই, কি আমার উপায় হবে বলে দিন।" তিনি আধশোয়া

অবস্থায় শুইয়াছিলেন, এই কথা কয়টি বলার সঙ্গে উঠিয়া বসিলেন এবং বলিলেন, "রাজার মেয়ে যদি ভিখারী সাজে দোষ কার বাপু ? স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মফলে ব্যাধের হাতে প্রাণ হারালেন। কর্ম্ম ক্ষয় হবে ক্রিয়া দ্বারা নিজ শক্তি অর্জ্জন করিলে। কর্ম্মভ্যো নমঃ। কর্ম্ম দ্বারা কর্ম্ম ক্ষয় হবে। নিজের মনে মনে সর্ব্বদা জপ করিলে অভাব দুঃখ কমিয়া যাইবে, শান্তি পাইবে।" ইহা যে কত সত্য কথা তা আজ বুঝিতেছি। তাই এখন বলি, "বাবা, তুমি কত দয়া করেছ, করিতেছ।"

বালবিধবা বলিয়া রাত্রে কখন আশ্রমে থাকিতে পাইতাম না। একদিন কি জানি আশ্রমে কি কর্ম্ম উপলক্ষে আমি যাই। বাবা বলিলেন, "আজ তুমি এখানে থাক রাত্রে, তরকারি কাটা ইত্যাদি করিবে," এবং যাহার সঙ্গে আমি গিয়াছিলাম তাহাকে বলিলেন, "তুমি যাও, বাড়ীতে খবর দিও।" যাই হোক, সেইদিন রাত্রে বাবা আহ্নিক করিয়া উঠিলে সকলের সঙ্গে আমিও উপরে বাবার ঘরে যাই। সকলের সঙ্গে বসিয়া আছি, খুব নিস্তব্ধ, মনে ভাবছি, একি সকলে চুপ ক'রে কেন ব'সে, কেউ কিছু বল্‌ছে না। এই সময় যদি বাবা আমাদের সকলের সঙ্গে গল্প করেন তো খুব ভাল হয়, কারণ যখনই আশ্রমে যাই, বাড়ী ফেরার জন্য বাবার কাছে পাঁচ সাত মিনিটের বেশী বসিতে পাইতাম না। অথচ বাবা শ্রীমুখে যাহাই বলিতেন, বুঝি বা না বুঝি, আমার খুব আনন্দ হইত। যাহার সঙ্গেই তিনি কথা বলুন না কেন, আমার মনে হইত, আমার সঙ্গেই কথা বলিতেছেন, ইহা ভাবিয়া তাঁহার প্রত্যেক

কথা স্মরণ রাখিতাম এবং কণ্ঠস্থ করিতাম। বাবা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "কিগো, তোমাদের তরকারি কোটা হয়েছে?" ইহার উত্তরে একজন দিদি বলিলেন, "হাঁ বাবা।" তখন বাবা বলিলেন, "একটি গল্প শোন।" যে গল্পটি বাবা বলিয়াছিলেন তাহাই বলিতেছি।

কোন দেশের একটি ছোট জঙ্গলে একটি সাপ ও একটি ব্যাঙ বাস করিত। দুইজনে খুব বন্ধুত্ব ছিল, কেহ কাহারও অনিষ্ট বা বিদ্বেষ করিত না। কিছুদিন যায়, একদিন সাপটি ব্যাঙ বন্ধুকে বলিল, "দেখ ভাই আর তো পারা যায় না, এখানে তো না খেয়ে আর পারি না। শুনেছি এই জঙ্গলের শেষে একটি ছোট পাহাড় আছে, তার ওপারে একটি সুন্দর নগর আছে। সেখানে গেলে আর খাওয়ার কষ্ট থাকে না। যাবে সেই দেশে? কিন্তু যাবার পথে অনেক বাধা বিঘ্ন আছে।" সেই কথা শুনে ব্যাঙ উত্তর করিল, "যখন না খেয়ে এখানে মরতে হবে, তার চেয়ে চেষ্টা করে দেখা যাউক কি হয়।"

এই কথার কিছুদিন পরে ব্যাঙ ও সাপ সেই নগর অভিমুখে যাত্রা করে। কিন্তু সমস্যা, নগরে যাবার দুটি রাস্তা—একটি খুব জটিল ও একটি সোজা। তবে সোজা পথে অনেক পাহাড় পর্ব্বত ডিঙ্গিয়ে যাইতে হইবে, আর শীঘ্র পৌঁছিবে; আর ঘুরে ঘুরে গেলে দেরী হইবে, কিন্তু পৌঁছিবে। ব্যাঙ বল্লে, "ভাই, আমি তো লাফিয়ে চলি, আমি সিধে পথেই যাই, যদি আগে পৌঁছি তোমার জন্যে অপেক্ষা করিব।" সাপ বল্লে, "তাই হবে।" এই বলে দুজনে যাত্রা কল্লে। ব্যাঙ মশাই লাফিয়ে

ডিঙ্গিয়ে নগরের ফটক পর্য্যন্ত পৌঁছে দেখলে নগরে যাবার একটি রাস্তা বা দরজা, তার সামনে একটি ছেলে ব'সে একটা ধামা ক'রে মুড়ি খাচ্ছে। দেখে ব্যাঙ একটু চিন্তা করেই মাল্লে এক লাফ, ছেলেটির মাথা ডিঙ্গিয়ে নগরে ঢুকে পড়লো। ছেলেটি হেসে হাততালি দিয়ে সেইদিকে চেয়ে রইল। আর সাপটি এঁকে বেঁকে যাত্রা সুরু কল্লে, অনেক দেরীতে বহুকষ্টে না খেয়ে আধ-মরা অবস্থায় নগরের দরজায় পৌঁছিল। তখন সন্ধ্যা হয় প্রায়। পৌঁছে দেখে একটি ছেলে মুড়ি খাচ্ছে, দেখে যাবার পথ স্থির হয়ে ভাবতে লাগল। এই দেখে ছেলেটি চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল। আওয়াজ শুনে ছেলেটির বাপ বাইরে এসে সাপটি দেখে ঘর থেকে একটি লাঠি নিয়ে সাপটির মাথায় মারিতেই উহা মরিয়া গেল, ছেলেটির কান্না বন্ধ হইয়া গেল।" বলিয়া বাবা চুপ করিয়া রহিলেন। মিনিট পাঁচেক পরে বাবা বলিলেন, "কিগো, গল্পটি কেমন ?" সকলেই "চমৎকার গল্প" বলিয়া উঠিলেন এবং আমরা সকলেই উঠিয়া আসিলাম, কারণ বাহিরে গুরুভাইরা দাঁড়াইয়া ছিলেন বাবাকে প্রণাম করিবার জন্য।

তাহার পরদিন বাড়ী আসিলে সন্ধ্যা বেলায় দাছু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে, কাল আশ্রমে রাত্রে রইলি, গুরুদেব কি সব উপদেশ দিলেন ?" "কই দাছু, কিছু উপদেশ তো দেননি। তবে খুব সুন্দর একটি গল্প বলিলেন।" বলিয়া রাত্রের শোনা গল্পটি দাছুকে বলিলাম। শুনিয়া দাছু বলিলেন, "ভারী সুন্দর উপদেশ দিয়েছেন। তবে সেটি আমায় দিয়াছেন। আচ্ছা, তুমি যখন আশ্রমে যাবে তাঁহাকে বলিও, 'গতি ছুইটিই ভাল, তবে ব্যাঙের

গতিটাই বেশী ভাল, আমার এই ধারণা'।" ইহার কয়েক দিন পরে বাবাকে দর্শন করিতে যাই, বাবাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতেই বাবা হাসিয়া বলিলেন, "কিগো, তোমার দাছু গতিটি ঠিক ক'রে নিলেন তো ভালই, তবে যে রাস্তায় যাও ক্ষতি নাই, কিন্তু পোঁছন চাই।" ইহার অর্থ আমি কি বুঝিব? এই ভাবের বহু কথা বহুবার আলোচনা হইত, সময় মত আবার লিখিবার চেষ্টা করিব।

বাবার দেহত্যাগ হইবার পর সর্ব্বদা বড়ই অভাব বোধ করিতাম। কাশীতে থাকিতে ভাল লাগিত না, দাছুকে এত ভালবাসিতাম, তবুও কাশী ভাল লাগিত না। সর্ব্বদা একটি অভাব বোধ হইত, কারণ বাবার দেহত্যাগের পূর্ব্বে কিছুদিন আমি বাইরে থাকি, এবং সেইখানেই এই দুঃসংবাদ শুনিতে পাই। কাশীতে বাবার কাজ হইবে জানিতে পাইয়া কাশীতে ফিরিয়া আসি। যে সময় আমি ষ্টেশনে নামি দাছুর একটি শিষ্য মণীন্দ্র আমাকে আনিতে গিয়াছিল। তাহার সঙ্গে আমি যখন মালদহিয়ার রাস্তায় আসি আশ্রমের সামনে হাত তুলিয়া প্রণাম করিলাম। মণি বলিল, "ছোড়দিদি নামিবে না?" কারণ যখনই কোথাও যাইতাম বা আসিতাম, আশ্রমে দর্শন করিতাম। কোন কথাই বলিলাম না, বাড়ী ফিরিয়া সকলকে প্রণাম করিয়া উপরে দাছুকে প্রণাম করিতে গিয়া দেখি, দাছু চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। প্রণাম করিয়া উঠিলে বলিলেন, "তুমি কিছু শুনিয়াছ?" "কি শুনিব দাছু?" "গুরুদেবের সম্বন্ধে?" "হাঁ, শুনিয়াছি তাঁহার দেহত্যাগ হইয়াছে। এইখানে তাঁহার কাজ হইবে" বলিয়া চলিয়া আসিলাম। হঠাৎ দাছু মাথা চাপড়াইয়া

চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন হায় হায় শব্দে। আমি অবাক্, আমার গুরুর দেহত্যাগ হইল, দাদুর কি দুঃখ হইল! আমার আজ মনে পড়ে সে সময় চোখে আমার এক ফোঁটাও জল পড়েনি। বলিলেন, "হায় হতভাগী, যে করুণাময় চিন্ময় পুরুষ স্থূলে এসে তোকে ধরা দিয়াছিলেন, তাঁকে ধরার চেষ্টা কিছু করলি নারে, তোর অন্ধ চক্ষু বন্ধ করে রহিলি, আজ তোর ভাগ্যাকাশে অশনি পতন হোল। চেষ্টা ক'রে যেদিন প্রত্যক্ষ আপন অন্তরে দেখবি সেদিন পুনঃ সূর্য্যের উদয় হবে, সে কতদিন পরে তিনিই জানেন। ভগবান্ তোকে তাঁর চরণ ছাড়া না করেন এই প্রার্থনা করি। যে স্থূল গুরু তোমার স্থূল বুদ্ধিতে হারিয়ে গেল, তাঁকে নিজ অন্তরে জাগাইবার চেষ্টায় এক মুহূর্ত্ত ভুল না হয়, দিদি।" আমি যেন কেমন হয়ে গেলাম। একি, সত্যই তো আর বাবাকে দেখতে পাব না, 'কি কল্লে আবার তোমায় দেখতে পাব', এই প্রশ্ন মনে কেবলই উঠিত। একদিন আর ঠিক থাকিতে না পারিয়া দাদুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা, যে গুরুকে আমি দেখেছি, তাঁহাকে কি আবার তেমনি দেখতে পাব?" "নিশ্চয় পাবে, সৎগ্রন্থ পাঠ কর, ক্রিয়া কর, সর্ব্বদা তাঁহাকে চিন্তা করার চেষ্টা কর। গুরুর অস্তিত্বে তোমার অস্তিত্ব। তিনি আছেন বলে তুমি নিজেকে বীণু বলে বোধ করিতেছ। তুমি চেষ্টা কর।" সেই সময় যত মহাপুরুষের জীবনী পড়িতে থাকি, আমাদের আশ্রমের থেকে "লীলাকথা" কিনি। একদিন মীরার বই পড়ি, তাহাতে এক জায়গায় পড়িলাম যে মীরা বলিতেছেন— "বিনা বিরহসে না মিলে নন্দলালা।" কিন্তু কই সে তোমার

জন্য বিরহ ঠাকুর, কবে প্রকৃত বিরহ জাগিবে তুমিই জান। কারণ ঐ বইতেই পড়েছি, মীরা বলছেন—এবারকার খেলায় "হারু তো ময় পিয়াকো। জীতু তো পিয়া হমারা।" তবে তাই হোক্ ঠাকুর এবারকার খেলায়।

যাই হোক, ইহার বছর দুই পরে বাবার অদ্ভুত দয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তখন আমি পুরুলিয়ায় আমার কোন ভগিনীপতির (আমাদের গুরুভাই ৺সরোজরঞ্জন মুখোপাধ্যায়) কাছে থাকি। সেখানে থাকাকালীন আমি প্রায় রাত্রেই অনেকক্ষণ অবধি পড়াশোনা করিতাম। একদিন রাত্রে ৺উপেনদাদার লেখা লীলা-কথা পড়িতে থাকি এবং মনে বড় আগ্রহ হয়, যদি দাদার মত আমি বাবার কাছে থাকিতাম তো আমিও বাবার কত বিভূতি দেখিতে পাইতাম। মনে বড় দুঃখ হইতেছে। সেই সময় যথাসাধ্য ক্রিয়া করিতে চেষ্টা করিতাম। ঐ অবস্থায় ঘুমাইয়া পড়ি। রাত কয়টা জানি না, ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, যেন ঘরে বাবা ডাকিতেছেন, "আর কত ঘুমাইবে? উঠ, মহানিশায় ক্রিয়া করা অভ্যাস কর।" ধড় মড় করিয়া উঠিয়া বসিলাম। কই বাবা? কিন্তু বাবার কথা স্পষ্ট শুনিলাম। একটু লক্ষ্য করিতেই গায়ের চেনা সুগন্ধ পাইলাম। তবু কিছু বুঝিতে পারিলাম না, উঠিয়া তিন তলায় ঠাকুর ঘরে চলিয়া গেলাম। তাহার পরে তিন চারিদিন রাত্রে ঐ একই ভাবে ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত এবং ঠাকুর ঘরে যাইতাম। কি যে করিতাম তাহা মনে নাই। তবে সকালে যখন জামাইবাবু পূজা করিতে উপরে যাইয়া দরজা ধাক্কা ও ডাকাডাকি করিতেন তখন চমক ভাঙ্গিত ও

দরজা খুলিয়া দিতাম। মনে হইত যেন মাথা টলিতেছে এবং সবই যেন শূন্য শূন্য মনে হইত। একদিন দিদি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই অমন আন্‌মনা হয়ে কি ভাবিস্? বল তো তোর কি হয়েছে?" "দিদি, তাতো জানি না" বলিয়া রাত্রের ঘটনা সব বলিলাম, কিন্তু দিদি শুনে মহাভয় পাইয়া গেলেন।

"সর্ব্বনাশ, আমি ঠাকুরমার কাছে গল্প শুনেছি, রাত্রে নিশাচর এইভাবে ডাকে এবং তিন ডাকে ডেকে নিয়ে যায় এবং মেরে ফেলে। সেই রকম নয় তো! আজ থেকে তুই আমার ঘরে বিছানা করে শুবি, একলা শুবি না।" "দূর্ দিদি, তুমি ভয় পেয়ো না। বাবার ডাক শুনে যদি ভূত ধরে, ভূত ছাড়াবে কে? হায়! আমি যে সমস্ত সময় উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকি, কখন রাত হবে, কখন ডাক শুনবো।" ঐ দিন রাত্রে যখন ঘুম ভাঙ্গে, উঠিয়া দেখি চারিদিক্ অন্ধকার। একটু ভয় করিতে লাগিল। দেখি গে কয়টা বেজেছে, কারণ দিদি বলেছে রাত্র বারটায় নিশাচর ডাকে। দর-দালানে এসে আলো জ্বালার আগেই যে বড় ঘড়ীটি টাঙ্গান ছিল, উহার শব্দে আন্দাজে সেইদিকে চেয়ে দেখি টর্চ্চের আলোর মত একটি আলো ঘড়ীর উপরে পড়িয়াছে। দেখিলাম দেড়টা বাজিয়াছে। যাক্, তবে নিশাচর চলিয়া গিয়াছে। উপরে উঠিতেছি, প্রত্যেক সিঁড়িতে গোল গোল আলো পড়িতেছে। একি! যাহা হউক, আসনে বসে বাবার ফটোর দিকে চেয়ে দেখি, ফটোতে সুন্দর আলো পড়িয়াছে। তখন মনে হোল, একি, আমার ভ্রম নয় তো? চোখ মুছে দেখি সেইভাবই। 'বাবা', 'বাবা' করিয়া চীৎকার করিয়া উঠি। চীৎকার

শুনিয়া জামাইবাবু ও দিদি দৌড়াইয়া আসেন এবং তাঁহারাও ঠাকুর ঘরে পদ্মফুলের গন্ধ পান। তারপরই সব উল্টে গেল। তার পরদিন দাদু আমাকে লইয়া যাইবার জন্য কাশী হইতে লোক পাঠাইলেন। কাশীতে ফিরিয়া আসিলাম। ক্রিয়া করা বন্ধ হইয়া গেল। দিন কতক সে ভাব বন্ধ হইয়া গেল। ধন্য বাবা, ধন্য তোমার লীলা! এমনি করে হাত ধরে নিয়ে চল ঠাকুর।

পাতকীর জীবনে শ্রীগুরুর করুণাদৃষ্টি

শ্রীগিরিধারীলাল ব্যাস

(১)

বাল্যাবস্থা হইতেই আমার মনের রুচি অধ্যাত্ম-তত্ত্বের দিকে ছিল, অবশ্য তখন আমার বুঝিবার শক্তি ছিল না। কিন্তু কোন স্থানে ভগবৎ-চর্চ্চা হইলে সেখানে আমার মন স্বভাবতঃই আকৃষ্ট হইত, ভগবানের লীলার কথা আমি শুনিতে খুবই ভালবাসিতাম। ১৯২৪ সালে জানুয়ারী মাসে পূজনীয় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ দাদার সঙ্গে পরম পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীবাবার দর্শনের জন্য গিয়াছিলাম এবং দর্শনের সৌভাগ্যও প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। তখনও মালদহিয়ার নূতন আশ্রম সম্পূর্ণ ভাবে রচিত হয় নাই, এবং বাবা হনুমান ঘাটে দিলীপগঞ্জের পুরাতন আশ্রমেই থাকিতেন। ইহাই আমার জীবনে সর্ব্বপ্রথম বাবার দর্শন। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে তাঁহার দর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই আমি ভিতরে আকর্ষণ অনুভব করিতেছিলাম এবং মনে হইতেছিল এবার বুঝি হারানিধি প্রাপ্ত হইলাম।

আমার মনে ইউরোপ দর্শনের উৎকট ইচ্ছা জাগিয়াছিল। শ্রীশ্রীবাবার দর্শন লাভের পর এই ইচ্ছা আরও প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। আমার ইচ্ছা ছিল যে ইউরোপ হইতে ফিরিয়া আসিয়া বাবার নিকট দীক্ষার জন্য প্রার্থনা করিব। পূর্ব্বে প্রার্থনা করিতে সাহসী হই নাই, কারণ আমার মনে মনে আশঙ্কা

ছিল যে দীক্ষা গ্রহণের পর ইউরোপে যাইবার অনুমতি হয়তো নাও পাইতে পারি। ইহার পর বিশেষ চেষ্টার ফলে দুই মাসের মধ্যেই আমার ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছিল। ইউরোপ হইতে ফিরিয়া আসিবার পর দেখিলাম যে আমার মাতামহ নিজের বাগান বাবার নিকট বিক্রয় করিয়াছিলেন। ১৯২৫ সালের বসন্ত-পঞ্চমী অথবা সরস্বতী পূজার দিন, শ্রীশ্রীগুরুদেব অভাজনকে দীক্ষা প্রদান পূর্ব্বক কৃতার্থ করেন। আমার জীবনে এইটি চিরস্মরণীয় দিন।

আমি অনেক মহাপুরুষের জীবন-চরিত্র পাঠ করিয়াছি এবং নানা ভাবে শুনিয়াছি। কিন্তু শ্রীশ্রীগুরুদেবের ন্যায় শক্তিশালী ও করুণাপূর্ণ মহাত্মার সন্ধান অন্যত্র কোথাও পাই নাই। বাবার স্বভাব একটি পাঁচ বৎসর বয়স্ক বালকের ন্যায় ছিল। তাঁহার সরল ও স্নেহপূর্ণ হাস্য আমার স্মৃতিতে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে—জানি না মৃত্যুও সেই চিহ্ন লুপ্ত করিতে পারিবে কিনা! শ্রীশ্রীগুরুদেব বাৎসল্য ও করুণার জীবন্ত মূর্ত্তি ছিলেন। যিনি ইহা প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছেন একমাত্র তিনিই ইহার স্বরূপ অনুভব করিতে পারিবেন।

এই পরম পুরুষের কৃপাপাত্র হওয়ার পর আমি আধ্যাত্মিক জগতে কি কি অনুভব প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা নিজের ব্যক্তিগত বিষয়—তাহা আলোচনা করিবার বিষয় নহে। ইহা গোপনীয় বিষয় এবং গুপ্তই রাখা উচিত। গুহ্য বিষয় প্রকাশ করিলে তাহার পরিণাম কি হয় তাহা নিম্নোক্ত ঘটনা হইতেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন।

(২)

আমি ১৯৩২ সালে শ্রীশ্রীগুরুদেবের সঙ্গে কলিকাতায় ছিলাম। রূপনারায়ণ নন্দন লেনে অর্থাৎ বাবার নিবাস স্থানে আমি প্রত্যহ তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিবার জন্য যাইতাম। একদিন আমি দুইটার সময় গিয়াছিলাম। ঐ সময় তাঁহার নিকট বিশেষ কেহ ছিলেন না। আমি তাঁহার নিকট উপবিষ্ট হইয়া নিজের ক্রিয়া সংক্রান্ত কোন কোন অনুভূতির বিষয় আলোচনা করিতেছিলাম। হঠাৎ আমার মনে হইল কেহ বোধ হয় ঘরে আসিয়াছেন। পেছন দিকে তাকাইয়া দেখিলাম একজন ভক্ত প্রণাম করিতেছেন। কিছুক্ষণ পর ভদ্রলোকটি চলিয়া গেলে বাবা হাসিয়া হাসিয়া আমাকে বলিলেন, "আজ যে অনুভবের কথা তুমি বলিতেছিলে উহা বন্ধ হইয়া যাইবে, কারণ তোমার শব্দ একজন আগন্তুকের কাণে পতিত হইয়াছে।" কেবল মাত্র অনুভূতি বিষয়ক গুটি কয়েক শব্দ অন্যের কাণে যাওয়ার ফলেই ক্রিয়ার উপর এরূপ প্রভাব পড়ে যে কিছু সময় পর্য্যন্ত অনুভব বন্ধ হইয়া যায়। বাবার কথা শুনিয়া আমার চিত্ত উদাস হইয়া গেল। বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে এই অনুভব কি চিরদিন বন্ধই থাকিবে? ইহার উত্তরে তিনি বলিলেন যে এই অনুভব ক্রিয়ার ফল স্বরূপ, কিছুদিন পর্য্যন্ত ক্রিয়া করিতে থাকিলে আবরণ সরিয়া যাইবার পর পুনর্ব্বার এই অনুভব জাগিয়া উঠিবে। পাঠক ইহা হইতে বুঝিতে পারিবেন যে আধ্যাত্মিক জীবনের ঘটনা বাহ্য জগতে প্রকাশ না করিবার কারণ কি?

(৩)

কাশীতে শ্রীশ্রীগুরুদেব যখন থাকিতেন তখন আমি কখনও বাহিরে যাওয়ার সময় তাঁহার শ্রীচরণে প্রণাম করিয়া যাত্রা করিতাম। একদিন আমি লক্ষ্ণৌ যাইতেছিলাম, ঐ সময় পার্শেল এক্সপ্রেস্ সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার সময় বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট হইতে ছাড়িত। ঐ এক্সপ্রেসেই আমার যাইবার কথা ছিল। আমি চাকরের সঙ্গে জিনিষপত্র ষ্টেশনে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম এবং নিজে শ্রীশ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করিয়া ষ্টেশনে যাইব মনে করিয়া আশ্রমে গিয়াছিলাম। বাবাকে প্রণাম করার পর বলিলাম, যে আমি সাড়ে ছয়টার গাড়ীতে আজই লক্ষ্ণৌ যাইতেছি। ইহা শুনিয়া গুরুদেব উঠিলেন এবং আমাকে প্রতীক্ষা করিতে বলিয়া নিজে ভিতরের ঘরে যাইয়া দ্বার বন্ধ করিলেন, এই অবস্থায় আমি তাঁহার ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত ঐ স্থান হইতে উঠিতে পারিলাম না। প্রায় পঁচিশ মিনিটের পরে তিনি বাহিরে আসিলেন এবং আমাকে বলিলেন, "যাও তোমার দেরী হইতেছে।" ঐ সময় ঘড়িতে ছয়টা পঁয়ত্রিশ মিনিট হইয়াছিল। আমি বলিলাম—"এখন তো গাড়ী বোধ হয় চলিয়া গিয়াছে।" ইহা শুনিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহা হইলে কোন্ গাড়ীতে যাবে?" আমি বলিলাম, "কাল প্রাতে পাঞ্জাবমেলে যাব।" ইহা শুনিয়া বাবা বলিলেন, "ঐ গাড়ী বেশ ভাল সময়ে ছাড়ে, ঐ গাড়ীতেই যাওয়া ঠিক হইবে।" আমি ষ্টেশনে জিনিষপত্র আনিতে যাইয়া শুনিলাম যে গাড়ী ঠিক সময়ে চলিয়া গিয়াছে। জিনিষপত্র নিয়া আমি বাড়ী

চলিয়া আসিলাম। দ্বিতীয় দিন প্রাতঃকালে যখন আমি বাবাকে প্রণাম করিয়া আবার ষ্টেশনে গেলাম তখন সেখানে জানিতে পারিলাম যে পূর্ব্বের দিনের রাত্রের পার্শেল এক্সপ্রেস্ (যাহাতে আমার যাওয়ার কথা ছিল) গত রাত্রেই সাহ-গঞ্জ ষ্টেশনের নিকট লাইন হইতে সরিয়া গিয়াছে এবং কয়েকটি কামরাতে কিছু কিছু ক্ষতিও হইয়াছে। আমি ভাবিলাম শ্রীশ্রীগুরুদেবের দয়াতে আমার জীবন রক্ষা হইল। লক্ষ্ণৌ হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনদিনের পর যখন শ্রীশ্রীগুরুদেবকে দর্শন করিতে গিয়াছিলাম তখন তাঁহাকে বলিলাম, "যদি ঐ দিন আমাকে এরূপ আদেশ দিতেন যে আমি যেন ঐ গাড়ীতে না যাই, তাহা হইলে আমি যাইতাম না।" তখন বাবা উত্তর দিলেন—"বৎস, আমি ঘর হইতে তখনই বাহির হইয়াছিলাম যখন তোমার ট্রেণ ষ্টেশন হইতে চলিয়া গিয়াছিল। যদি তুমি ঐ ট্রেণে যাইতে তাহা হইলে তোমাকে রক্ষা করার জন্য আমাকে সাহ-গঞ্জে ঝঞ্ঝাট করিতে হইত।" ইহা গুরু-কৃপার একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। সত্যই গুরু নিজ সন্তানের উপর সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন।

(৪)

১৯২৮ সালের মে মাসে* শ্রীশ্রীগুরুদেব কামরূপ কামাখ্যা

---

*এই সন ও তারিখটি ঠিক নহে। বাবা কামাখ্যা যান ১৯২৭ সনের জুন মাসে। বহু লোক সঙ্গে ছিলেন। আমিও ছিলাম। আমি ১১ই জুন কাশী হইতে যাত্রা করি, ১২ই কলিকাতা রূপনারায়ণ নন্দন লেনে পৌঁছি। সেখানে চার দিন থাকিয়া ১৭ই তারিখ বাবার সঙ্গে

গিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে যাইব এইরূপ আমারও ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কোন কারণ বশতঃ যাইতে পারি নাই। বাবার সঙ্গে শ্রীযুক্ত গোপীনাথ দাদা এবং আরও অনেকে গিয়াছিলেন। ঐ মে মাসে আমি কাশীতে কলেরাতে আক্রান্ত হই—দ্বিতীয় দিন শেষ রাত্রি তিনটার সময় আমার জীবনের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন হয়। হাতের বগলের নাড়ী উঠিয়া গিয়াছিল, পায়ে অত্যন্ত পীড়া হইতেছিল দুর্ব্বলতা এবং মনের অবসাদ এত বেশী ছিল যে আমি শয্যার উপরে মাছের ন্যায় ছট্‌ফট্ করিতেছিলাম। ভোর বেলা চারটার সময় ডাক্তার শোভারাম দাদা আমাকে দেখিতে আসেন, তিনি আমার অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হন। তাঁহার ভাবগতিক দেখিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম যে আমার বাঁচার আশা নাই। তখন আমি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে শ্রীশ্রীগুরুদেবের নিকট একটি আরজেণ্ট তার করিতে অনুরোধ করিলাম। ০ এই তার ডাঃ শোভারামই

কামাখ্যা রওনা হই ও ১৮ই তারিখ আমীনগাঁও ও পাণ্ডু হইয়া কামাখ্যা পৌঁছি। বাবা সমগ্রভাবে তিনদিন কামাখ্যাতে ছিলেন—অর্থাৎ ১৯শে হইতে ২১শে পর্য্যন্ত। ২২শে জুন কামাখ্যা হইতে রওনা হইয়া গৌহাটী ও বশিষ্ঠাশ্রম দর্শন করিয়া ২৩শে জুন কলিকাতা ফিরিয়া আসেন। ২০শে তারিখ কাশী হইতে ডাক্তার শোভারাম দাদার তার পাওয়া যায়—তাহার ভাবা এই, "Giridhari Lal seriously ill with Diarroea and vomitting craves for your asirbad." সুতরাং গিরিধারী দাদার বর্ণিত ঘটনা ১৯০৮ সালের মে মাসের নহে, কিন্তু ১৯২৭ সালের ২০শে জুন তারিখের।

—শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ

পাঠাইয়া ছিলেন। ইহাতে প্রার্থনার সহিত আমার তৎকালীন অবস্থার কথার বর্ণনা ছিল। এদিকে আমার অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইতে লাগিল। বৈদ্যজী ঔষধ দিলেন, ডাক্তারও ইন্‌জেক্‌সন দিলেন, কিন্তু কোনই ফল হইল না, বরং অবস্থা ক্রমশঃই খারাপের দিকে যাইতে লাগিল। চিকিৎসক এবং বাড়ীর সকলে আমার অন্তিম ক্ষণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে ঘড়িতে আটটা বাজার শব্দ হইল। ঠিক ঐ সময় আমি অনুভব করিলাম, আমার শরীরে অকস্মাৎ বলের সঞ্চার হইতেছে। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা আসিয়াছিল, তাহা সরিয়া গেল। পায়ের অবসাদও কমিতে লাগিল। নাড়ীও ঠিক ভাবে যথাস্থানে প্রকাশিত হইল। এই অনুভবের উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, ফুটবলে পাম্প করিলে যেমন বায়ু পূর্ণ হয় ঠিক সেই প্রকার আমার শরীরে পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যেই শক্তির সঞ্চার হইয়া গেল। তখন বাহিরের লোক মনে করিয়াছিল যে ঔষধের ক্রিয়া হইতেছে; ধীরে ধীরে আমার শরীর সুস্থ হইল। সাত আট দিন পরে পূজনীয় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ দাদা কাশী ফিরিলে পর আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই আমাকে স্নেহের দৃষ্টিতে দেখেন। তিনি আমাকে আমার তার পাওয়ার পর কামাখ্যাতে শ্রীশ্রীগুরুদেবের সান্নিধ্যে কি ঘটনা হইয়াছিল তাহা বলিলেন। আমার তার সাতটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে বাবার নিকট পৌঁছিয়াছিল। তার পাইয়াই বাবা গোপীনাথ দাদাকে পড়িতে দিলেন। তিনি উহা পড়িলেন এবং আমার জন্য বাবার নিকট প্রার্থনা করিলেন।

বাবা তখনই উঠিয়া ভিতরের একটি ঘরে চলিয়া গেলেন ও উহার একটু পরেই আবার বাহিরে আসিয়া বসিলেন। বাহিরে আসিলে পর গোপীদা আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন, অর্থাৎ আমার সম্বন্ধে চিন্তার কারণ আছে কিনা জানিতে চাহিলেন। বাবা উত্তরে বলিলেন, "এখন ঠিক আছে, কোন ভয়ের কারণ নাই।" ঐ সময় প্রাতঃকাল, ঠিক আটটা বাজিয়াছিল। ঐ সময় আমার অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল তাহা পূর্ব্বেই লিখা হইয়াছে। ইহা হইতে পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে শ্রীশ্রীগুরুদেবের করুণাময় শক্তি কি ভাবে একই ক্ষণের মধ্যে আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল।

—ক্রমশঃ

পতিতের নাথ

রায় সাহেব শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত, কবিরত্ন, এম-এ

পতিতের নাথ পতিতে তারিতে
ধরা দিলে ধরা মাঝে,
পতিত সকল পড়িয়া রহিল
তুমি গেলে কোন কাজে।
স্নেহের তোমার তুলনা ছিল না,
ক্ষমার ছিল না শেষ,
অধম বলিয়া ভুলিয়া থাকিবে
ইহা কি তোমারে সাজে ?
তোমার চরণ-ছায়ায় বসিয়া
গরব জাগিত মনে,
নিজের দীনতা হীনতা হেরিয়া
ম'রে যাই এবে লাজে।
ফুলকে করিতে স্ফটিক পয়াল
তামাকে করিতে সোনা,
তোমার পরশে নারকী রহিব
ভাবিতে মরমে বাজে।
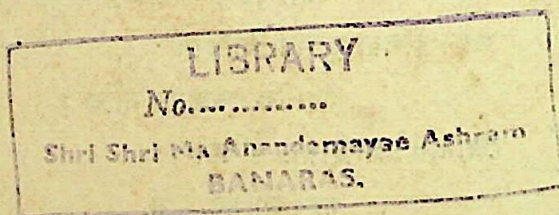
শ্রীশ্রীমদ্ বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেব বিষয়ক প্রকাশিত পুস্তকাবলী

১। শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ প্রসঙ্গ (৫ খণ্ড)—

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ প্রণীত

প্রথম ভাগ—চরিত-কথা—১ (অনুপলভ্য)

দ্বিতীয় ভাগ—তত্ত্ব-কথা—১—১।০ আনা

তৃতীয় ভাগ—লীলা-কথা

পূর্বার্দ্ধ—১—১।০ আনা

উত্তরার্দ্ধ—১-২—১৲+১৲ টাকা

২। যোগিরাজাধিরাজ শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস—

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত প্রণীত—৫৲ টাকা

৩। শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস রচিত গীতরত্নাবলী—

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ সম্পাদিত—।√০ আনা

৪। বিশুদ্ধবাণী— শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ সম্পাদিত

প্রথম ভাগ—২৲ টাকা

দ্বিতীয় ভাগ—২৲ টাকা

তৃতীয় ভাগ—২৲ টাকা

চতুর্থ ভাগ—২৲ টাকা

পঞ্চম ভাগ—২৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—

কার্য্যকারক—

"বিশুদ্ধানন্দ কানন আশ্রম"

মালদহিয়া, বেনারস।